আর্য্য নীতিবিজ্ঞান।

উচ্চপাঠ।

অনুবাদক

শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত বি, এ,

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

কলিকাতা।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬৭ নং হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, রেকর্ডার প্রেস হইতে শ্রীমিহির চন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৸০ বারআনা মাত্র।

আর্য্য নীতি বিজ্ঞান।

প্রথম অধ্যায়।

নীতি বিজ্ঞান কি?

মানবগণের পরস্পরের ও অন্যান্য জীবসকলের প্রতি ব্যবহারবিষয়ক শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞানকে নীতিবিজ্ঞান কহে। মনুষ্যের আচরণ, তাহার নিজ চরিত্রের সহিত ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবসমূহের সহিত সম্বন্ধ; সুতরাং যে সমস্ত নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে মানব নিজের ও অপরের সুখ শান্তি এবং আনন্দের সম্পুর্ণ উপযোগী হইতে পারেন, তাহা সুশৃঙ্খলভাবে বিধিবদ্ধ করা নীতিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। দেশ কাল ভেদে আমাদের সন্নিহিত সমুদায় জীবের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলে সকলের পক্ষে সম্পুর্ণ শুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা আমাদের নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত আমাদের কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র উত্তোরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের নিজের ও স্বসম্পর্কীয় পদার্থনিচয়ের কিরূপ ব্যবহারে সম্পুর্ণ শুভফল লাভ হইতে পারে, তাহাও আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। অবশ্যই দেশ কাল ও পাত্র ভেদে শুভাশুভের তারতম্য হইতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে নীতিবিজ্ঞান একটি সাপেক্ষ (relative) বিজ্ঞান—ইহা মনুষ্যের নিজের সহিত ও তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবসমূহের সহিত সম্বদ্ধ।

কালবিশেষে ও দেশবিশেষে যত জীব আছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পরস্পরানুকূল সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক যাহাতে সার্ব্বজনীন সুখ ও শান্তি উৎপন্ন হয়, তাহার উপায় বিধান করাই নীতিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এক পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে—সমাজস্থ বিভিন্ন পরিবারবর্গের মধ্যে—এক দেশস্থ বিভিন্ন সমাজের মধ্যে—সমগ্র মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সমাজের মধ্যে এবং মনুষ্যের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য সর্ব্বজীবের মধ্যে—অবশেষে এ জগতের জীবকুলের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য লোকের ও অন্যান্য জগতের অধিবাসীগণের মধ্যে পরস্পরের সুখ ও শান্তিজনক সম্বন্ধ স্থাপন করা এই নীতিবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। নীতিবিজ্ঞানের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর এবং বৃহত্তর হইতে বৃহত্তমে পরিণত হয়। কিন্তু তাহার পরিধি যতই বর্দ্ধিত হউক না কেন, সর্ব্বত্রই সার্ব্বজনীন প্রীতি, সুখ ও শান্তি বিধান করা নীতিবিজ্ঞানেব মুখ্য উদ্দেশ্য।

নীতিবিজ্ঞান—পবিবাবিক নীতি, সামাজিক নীতি, জাতীয় নীতি, আন্তর্জাতিক নীতি, সমগ্র মানবজাতির নীতি, আন্তর্জাগতিক (inter-world) নীতি প্রভৃতি বিবিধভাগে বিভক্ত। এই সমুদায় নীতিই মানবের পালনীয়। নীতিবিজ্ঞানের এতদপেক্ষা উচ্চতর স্তর এখন আমাদের সাধ্যাতীত; কিন্তু জানা উচিত যে, সমগ্র নীতিবিজ্ঞান একই মূলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই এক।

মানবের সহিত দূরাদূরস্থ সর্ব্বজীবের প্রীতি ও সখ্য স্থাপিত হইলে যে জগতে সর্ব্বত্র সুখ ও শান্তি বিরাজিত থাকিবে, ইহা সহজেই অনুমেয়।

আমরা অনুক্ষণই সৌহার্দ্দের অভাব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সহকারিতার অভাব, একতার অভাব, বিবাদ বিসংবাদজনিত কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। যেখানেই অসৌহার্দ্দ, সেইখানেই অসুখ ও অশান্তি। প্রত্যেকেই যদি নিজের জন্য না ভাবিয়া পরের জন্য ভাবে, তাহা হইলে কাহারও জন্য ভাবিবার লোকের অপ্রতুল হয় না; কিন্তু যদি সকলেই নিজের জন্য ভাবে, তবে প্রত্যেকের জন্য ভাবিবার নিজে ভিন্ন আর কেহ থাকে না। প্রীতিতেই সুখ, অপ্রীতিতেই দুঃখ। নীতিবিজ্ঞান সমাজে ও জগতের সর্ব্বত্র সহানুভূতি ও প্রীতি স্থাপনপূর্ব্বক সার্ব্বজনীন সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং নীতি বিজ্ঞান পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় সার্ব্বজনীন সুখের হেতুভূত। এই সার্ব্বজনীন সুখ, সম্পদ ও মঙ্গলের বিধানই নীতিশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য। ইহাই যে মানব জাতির উন্নতির পরাকাষ্ঠা, তাহা ষড়দর্শন একবাক্যে স্বীকার করেন।

শিক্ষার্থীগণের এই বিষয়টি দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করা ও সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা একান্ত কর্ত্তব্য। সুনীতি ও সদাচারই সার্ব্বজনীন সুখ ও আনন্দের মূল। এই স্থলে "সুখ ও আনন্দ" বলিলে কি বুঝায়, তাহা একটু ভাবিয়া দেখা যাউক। সুখ বা আনন্দ বলিলে ইন্দ্রিয়ের ভোগলিপ্সা চরিতার্থতাহেতু ক্ষণিক সুখ, অথবা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী মানসিক সুখ বুঝাইবে না; উহা দুঃখলভ্য বা দুঃখ পরিণামী বলিয়া দুঃখের আকার ভেদ বা আনন্দের বিকার মাত্র। জীবের উপাধিসমূহের ভোগেচ্ছা-তৃপ্তিজনিত বা বাহ্যবস্তুলাভজনিত ক্ষণিক উন্মত্ততাকে প্রকৃত আনন্দ বলে না। জীবাত্মার পুরুষার্থ লাভহেতু যে গভীর শাশ্বত আত্মপ্রসাদ জন্মে, তাহাকেই প্রকৃত আনন্দ বা সুখ বলে। সে আনন্দাবস্থা কিরূপ তাহা গীতায় ভগবান বলিতেছেন :—

"যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥
(গীতা ৬অঃ ২০।২২)

যেই অবস্থায়, যোগের সেবায়
চিত্তের নিরোধ হয়।
হয় উপরতি শুদ্ধ হয় মতি
আত্মবোধ সুনিশ্চয় ॥
আত্মায় আত্মাকে করি দরশন
আত্মার সন্তোষ হলে।
ইন্দ্রিয় অতীত সুখ নিরমল
লব্ধ শুদ্ধ বুদ্ধি ফলে ॥
যেই অবস্থায় হলে অবস্থিত
এই আত্মা পুনর্ব্বার।
বিচলিত কভু নাহি হন আর
সেই সুখ চমৎকার ॥
যাহা লাভ হ'লে অপর লাভের
আশা নাহি রহে মনে।
গুরু দুঃখ ভারে কাঁপে না হৃদয়
পেলে আত্মানন্দ ধনে ॥

এতন্ন্যূন কোনও অবস্থাই প্রকৃত সুখ বা আনন্দ পদ বাচ্য হইতে পারে না। এই আনন্দই নীতিশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য। বাহ্যিক ব্যাপারের সহিত এই সত্যের অসঙ্গতি হইলেও যেন শিক্ষার্থীরা এই গভীর তথ্যটি

কখনও ভুলিয়া না যান। সময়ে সময়ে কর্ত্তব্য পালন যতই দুরূহ হউক না কেন, সুনীতিমার্গ অবলম্বন যতই ক্লেশকর ও দুঃসহ হউক না কেন, তাঁহাদের যেন সর্ব্বদা এই দৃঢ় জ্ঞান থাকে যে, চরমে নীতি পালনই নিরতিশয় আনন্দকর এবং নীতি লঙ্ঘনই একান্ত দুঃখজনক। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, "যেমন চক্র শকটবাহী বলিবর্দ্দের অনুগমন করে, তেমনই দুঃখ পাপের অনুগমন করে।" সর্ব্বদেশের সর্ব্বশাস্ত্রেই এই সত্যের ঘোষণা আছে। পরে আমরা দেখিতে পাইব যে এই সত্য অখণ্ডনীয়।

আমরা পৃথিবীর ও অন্যান্য জগতের অধিবাসিগণের সহানুভূতি, সৌহার্দ্দ, প্রীতি, সুখ, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয় আলোচনা করিলাম। কিন্তু আমরা যদি এই বিষয়ের মুলতত্ত্বের অন্বেষণ করি, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে হইবে। কারণ, ধর্ম্মতত্ত্বই নীতিবিজ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি। যেমন ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে প্রাসাদ সুদৃশ্য হইলেও তাহা অচিরে ভাঙ্গিয়া বা বাঁকিয়া যায়, তেমনই ধর্ম্মরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নীতিবিজ্ঞান রূপ প্রাসাদ গঠিত না হইলে তাহা বক্রগামী ও ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মই নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি।

(১) ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা এই যে আত্মা এক এবং আমাদের বহুত্বজ্ঞান ভ্রান্তিমূলক। সকল জীবাত্মাই এক পরমাত্মার অংশ এবং সেই একেতেই চির প্রতিষ্ঠিত। এই অদ্বৈত তত্ত্বই নীতিবিজ্ঞানের মূলভিত্তি।

অসংখ্য অনাত্ম পদার্থের মধ্যে আত্মার একত্ব উপলব্ধি।

আত্মা এক এবং পৃথক পৃথক জীবাত্মা সকল সেই একই আত্মার অংশ বা অংশুমালা; সুতরাং তাহারা সর্ব্বসাকল্যে একমাত্র। গীতা বলিতেছেন ঃ—

"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥"
(গীতা ১৩ অধ্যায় ৩৪)

এক সূর্য্য প্রকাশয়ে সকল ভুবন।
ক্ষেত্রী ও সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশে তেমন ॥

"একো দেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ॥
(শ্বেতাশ্ব ৬,১১)

"এক অদ্বিতীয় দেব বিশ্বপ্রাণ।
সর্ব্বভূতে গূঢ় রূপে বর্ত্তমান ॥
সর্ব্বব্যাপী তিনি আত্মা সবাকার।
কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বভূতে স্থিতি তাঁর ॥
সাক্ষী তিনি সকলের চেতন কারণ।
কেবল, নির্গুণ তিনি জগত জীবন ॥

এক সূর্য্য স্বপ্রভায় ভাস্বর হইয়া চরাচর জগতের প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক খণ্ড প্রতিভাসিত করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীর-বেষ্টিত সহস্র উদ্যান যেরূপ একই সূর্য্যের তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হয়—(ঐ তাপ ও আলোক একই সূর্য্যের অংশ) সেইরূপ জড়প্রকৃতির প্রাচীরেপরিবেষ্টিত অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহবদ্ধ জীবাত্মা সকল পরমাত্মারূপ একই সূর্য্যের অংশুমালা, একই মহাপাবনের বিস্ফুলিঙ্গসমূহ, একই অদ্বয় আত্মার অংশ। যতদিন না আমরা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হই, ততদিন আমরা এই গুহ্য তত্ত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিব না * কিন্তু আমরা ইহাকে একটী বাস্তব সত্য—একমাত্র

---

* একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথাটী আরও একটু বিশদ হইতে পারে। সকল পদার্থে, জগতের সর্ব্বত্রই electricity বা তড়িৎ আছে; ধর্ম্মতলা হইতে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত যে তার গিয়াছে, তাহার সর্ব্বাংশেই তড়িৎ প্রবাহ বিদ্যমান আছে, কিন্তু সেই তড়িৎ শক্তির বিকাশ ঐ তারের সর্ব্বস্থানে অথবা জগতের সর্ব্বত্র নাই। তড়িৎ শক্তির বিশেষভাবে বিকাশের জন্য—তদ্দ্বারা বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াসাধন জন্য—তদুপোযোগী উপাধির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। যেখানে তদুপযোগী অনুষ্ঠান করা আছে, সেই সেই স্থানেই তড়িতের দীপ জ্বলিতেছে বা তদ্দ্বারা বায়ুবীজন হইতেছে, কিংবা যান ও সংবাদ বহন হইতেছে। সেইরূপ জগতের সকল পদার্থেই সর্ব্বত্রই তাপ বা অগ্নিতত্ত্ব অনুক্ষণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু সেই তাপশক্তির বিকাশ—অগ্নি-শিখারূপে বিকাশ,—জগতের সর্ব্বত্র অনুক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না। যেখানে যেখানে তাহার অগ্নিশিখারূপে বিকাশোপযোগী অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই অগ্নিশিখা ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে। শক্তিকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হইলে তাহার উপাধির আবশ্যক। উপাধি ব্যতীত কোনও শক্তির বিকাশ হইতে পারে না। উপাধির অভাব হইলে শক্তি অব্যক্ত ভাবে থাকে। কিন্তু দুইটী তড়িৎ দীপের বা দুইটি অগ্নি-শিখার অন্তবর্ত্তী স্থান, দীপ বা অগ্নিশিখাশূন্য বলিয়া, কি বলিতে হইবে, যে ঐ স্থানে তড়িৎ বা তাপশক্তি নাই? না জগতের সর্ব্বত্র সকল পরমাণুতে তড়িৎ বা তাপ অনুক্ষণ বিদ্যমান নাই? বা তড়িৎ ও তাপ শক্তি সর্ব্বব্যাপী নহে? অব্যক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়

অত্যাবশ্যক প্রকৃত তত্ত্ব—বলিয়া অধিগত করিতে পারি এবং যে পরিমাণে আমরা এই মূল তত্ত্ব অনুসারে জীবনকে নিয়মিত করিতে পারিব, সেই পরিমাণে আমরা পবিত্র ও নীতিবান হইতে পারিব। আমরা নীতিতত্ত্ব যতই আলোচনা করিতে থাকিব, ততই আমাদের প্রতীতি হইবে যে নীতিবিজ্ঞানের সকল বিধানই সর্ব্বাত্মার একত্ব রূপ মহাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি সর্ব্ব আত্মা এক হয়, তাহা হইলে যে কার্য্য দ্বারা আমি আমার প্রতিবেশীর অনিষ্ট করি, তদ্দ্বারাই আমার নিজ অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। কেহ কখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজের হস্তপদাদি কাটে না, কারণ সেগুলি তাহার নিজ দেহের অংশ। হস্তে আঘাত লাগিলে পদে বেদনা হয় না বটে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গেই যন্ত্রনা ও পীড়া অনুভূত হয় এবং এক অঙ্গের আঘাত জন্য সর্ব্বাঙ্গই অসুস্থ বোধ হয়। হস্তপদাদির যদিও এরূপ বোধ নাই যে তাহারা একই দেহের অংশ ও একই জীবাত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত তথাপি তাহাদের পরস্পরের পীড়ার জন্য পরস্পরকে কষ্ট অনুভব করিতে হয়। অবশ্য চরমে হস্তের আঘাত হেতু পদ-কেও কষ্ট অনুভব করিতে হয়। যদি হস্ত ছেদন করা যায় তাহা হইলে পদ হইতে রক্ত নির্গত হয় না বটে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে পদকে রক্তস্রাব-জনিত দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে হয়; কারণ একই রক্ত সমুদায় দেহে প্রবাহিত হইতেছে। সমুদয় রক্তের উৎপত্তি স্থান এক। তদ্রূপ এক ব্যক্তি অপরকে আঘাত করিলে আঘাতকারীকেও চরমে কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তবে সে কিছু বিলম্বে কষ্ট বোধ করে এইমাত্র বিশেষ। পদ অজ্ঞতা ও

গোচর না হইলেও তাপ ও তড়িৎ সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সেইরূপ অব্যক্তরূপে পরমাত্মাও সর্ব্বব্যাপী; উপযুক্ত উপাধির সহযোগে বিশেষ বিশেষ জীবাত্মারূপে বিকাশিত হয়।

সসীমতা নিবন্ধন হস্তের আঘাত অনুভব না করিতে পারে, কিন্তু জীবাত্মা সর্ব্বাঙ্গের অবস্থা অনুভব করে, সুতরাং যেস্থানে যাইলে হস্তে সেরূপ আঘাত পাইবার সম্ভাবনা, পদকে তথায় আর যাইতে দেয় না। সেইরূপ যিনি জানেন যে সর্ব্বত্র একই আত্মা সর্ব্বজীবকে অনুপ্রাণিত করিয়া আছে, তিনি অবশ্যই বুঝিতে পারেন যে আত্মার একাঙ্গে আঘাত হইলে তাহার অন্যান্যাংশে (বিভিন্ন উপাধিগ্রস্ত হইলেও) তজ্জনিত কষ্ট অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং অপর জীবের অনিষ্ট চেষ্টা দ্বারা নিজ অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য, হস্তের আঘাত জনিত জ্বর আসিলে অবশেষে সর্ব্বশরীরকে কষ্ট পাইতে হয়; কারণ সর্ব্বাঙ্গের একত্বের অজ্ঞতা কিছু একত্বকে লোপ করিতে পারে না। অতএব যিনি জানেন যে জগতে একের অনিষ্ট হইলে, তখনই হউক বা বিলম্বে হউক, অপরের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী, তিনি সকলকে একেরই অংশ বলিয়া বোধ করেন, সকল দেহকে একই মহাদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে জ্ঞান করিতে শিক্ষা করেন এবং নিজের অন্তস্তম আত্মাকে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বলিয়া উপলব্ধি করেন ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন।

যদি আমরা এই গূঢ়তত্ত্ব বিশেষরূপে অধিগত করিতে এবং সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারি তবে আর নীতিবিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না; কারণ স্বেচ্ছায় কেহ নিজ অনিষ্ট করে না। অতএব আমরা আপনা হইতেই সকলের সর্ব্বাঙ্গীন ইষ্টসাধনে যত্নবান হইব। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই তত্ত্ব সহজে অধিগত করা যায় না এবং উপলব্ধি ত কদাচিৎ ঘটে; তজ্জন্যই নীতিবিজ্ঞানের প্রয়োজন ও নীতিপালন একান্ত আবশ্যক। নীতিশাস্ত্রের সকল বিধানই এই মূলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহা মানবগণকে নিজের ও পরের অনিষ্ট চেষ্টা হইতে বিরত করে ও নিজের ও পরের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনে তৎপর করে।

আর্য্য ঋষিগণ সর্ব্বভূতের একই আত্মা এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়া তাহার উপর সকল বিধান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; এই অচল শিরেই তাঁহাদের নীতিশাস্ত্ররূপ দুর্গ সুনির্ম্মিত করিয়া রাখিয়াছেন। নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদোক্ত আপ্তবাক্য সকল প্রামাণিক ও অখণ্ডনীয়। অবশ্য সেই সমস্ত শ্রুতিবিধান প্রজ্ঞা ও যুক্তি দ্বারা সমর্থনীয় ; তাহারা যে সর্ব্ব মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে পালনীয় ও অলঙ্ঘনীয় তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

সকল প্রাকৃতিক বিধিই (natural laws) ঐশী প্রকৃতির (Divine Nature), ঐশী শক্তির বাহ্যবিকাশ এবং চিৎশক্তি ঐ ঐশী প্রকৃতির অন্তর ভাব বলিয়া চিচ্ছক্তির সাহায্যে, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাবলে, সেই বিধি সকলের প্রমাণ ও উপলব্ধি হইতে পারে। তাহারা সকলেই নিতান্ত প্রজ্ঞাসিদ্ধ এবং মনুষ্যের প্রজ্ঞা তাহাদেরই অনুশীলনে লভ্য। এই প্রজ্ঞাকে সাধারণ তর্কশাস্ত্র বলিয়া কেহ যেন ভুল না করেন। সাধারণ তর্কশাস্ত্র এই প্রজ্ঞার অন্যতর ও একটী নিম্নভাব মাত্র। প্রজ্ঞাই চিৎ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়া—প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষ সর্ব্বলোকের সর্ব্বসত্যের অপরোক্ষানুভূতি তাহাবই অন্তর্ভুক্ত—তাহারই বিকাশ সাপেক্ষ। জ্ঞানই সমস্ত প্রমাণের মূল (source of authority) এবং ঋষিদিগের জ্ঞান সেই ঈশ্বরের চিৎশক্তি অনুগামী প্রজ্ঞালব্ধ বলিয়া তাঁহাদিগের প্রদত্ত শ্রুতিই একমাত্র প্রামাণ্য আপ্তবাক্য। এই আপ্তবাক্য সকল মুখ্যতঃ ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গৌণভাবে দিব্যালোকদীপ্ত মনুষ্য প্রজ্ঞালব্ধ। আমরা এই গ্রন্থের * প্রথমাংশের উপক্রমণিকায় আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঋষিরা শ্রুতিবাক্যসকল অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যুগের জন্য তদুপযোগী ব্যবস্থাসমূহ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন ; কারণ, যে বিধি এক যুগের

* সনাতন ধর্ম্ম—উচ্চশিক্ষা" গ্রন্থ দেখ।

উপকারী, তাহা যুগান্তরের উপযোগী না হইতে পারে। আরও প্রজ্ঞার সাহায্যে শাশ্বত (সর্ব্বকালিক) ও সর্ব্বলৌকিক বিধানগুলিকে দেশ-বিশেষ ও কালবিশেষে পালনীয় বিধান হইতে নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে।

সনাতন ধর্ম্মোপদিষ্ট নীতিবিজ্ঞান এইজন্যই নিরতিশয় প্রামাণিক। ইহা আত্মার একত্বরূপ মহাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দিব্য প্রজ্ঞালব্ধ। ইহার প্রত্যেক বিধান প্রজ্ঞা ও যুক্তি সাহায্যে প্রামাণ্য, কারণ শ্রুতির প্রত্যেক বিধিই বিবেক বুদ্ধির সিদ্ধান্ত সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যযুক্ত।

শ্রুতি ও মানবপ্রজ্ঞার সর্ব্ববিষয়ে এইরূপ সাহচরিত্ব নিবন্ধন এদেশে নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই। প্রত্যুত এই সামঞ্জস্যের অভাববশতঃ পাশ্চাত্য দেশে নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা বিভিন্ন মত প্রচলিত দেখা যায়।

অন্যান্য জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সর্ব্বাত্মার একত্বরূপ মহাসত্য স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায়, তাঁহারা নীতিশাস্ত্রের এই অখণ্ডনীয় আদিকারণ ও ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তাঁহারা নীতিশাস্ত্রকে কেবল মাত্র দৈববিধানরূপে প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বরকে যেরূপ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, অনেকে তাহার সহিত মানবাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মার বিবিধ ভাববৈষম্য দেখিয়া থাকেন। সুতরাং মানব প্রজ্ঞার সহিত আপ্তবাক্য সমূহের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে ধর্ম্মশাস্ত্র বিরোধি অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রোপেক্ষাকারী আর দুইটী নীতিবিজ্ঞানের মতের আবির্ভাব হইয়াছে।

এই দ্বিবিধ মতের এক প্রকারের নাম আত্মপ্রজ্ঞা বা বিবেকবাণীবাদ (Doctrine of Intuition or Conscience)। তাঁহারা বলেন যে বিবেক

বলে মানবের মনে হিতাহিত বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান স্বতঃই প্রতিভাত হয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সভ্যতার, বিভিন্ন সমাজের, বিভিন্ন জাতির ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শিক্ষার ভেদে বিবেকেরও বিবিধ অনৈক্য লক্ষিত হয়। যাহাকে এক সমাজ ভাল বলে, তাহা অন্য সমাজে মন্দ বলিয়া প্রচলিত থাকায় বিবেকবাণী ও তত্তৎ সমাজ শিক্ষার অনুগামী হয়। আবার অনেক সময় ব্যক্তিগত জ্ঞান ও চরিত্রের উন্নতির তারতম্য বশতঃ বিবেকবাণীরও তারতম্য হয় অর্থাৎ বিবেকেরও ক্রমাভিব্যক্তি আছে।

অপর মতটীর নাম হিতাধিক্যবাদ (Utilitarianism) এইমতে যদ্দ্বারা অধিকতম লোকের অধিকতম হিতসাধন হয় (greatest good of the greatest number) তাহাই নীতিসঙ্গত ও কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহা অল্প সংখ্যক লোকেরও অহিতকর, তাহা কিরূপে ন্যায় বা পুণ্য কার্য্য বলিয়া বিহিত হইতে পারে ? এ প্রশ্নের কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর তাঁহারা দিতে অক্ষম। বিশেষতঃ কিসে যে অধিকতম লোকের অধিকতম হিত সাধন হয় এ বিষয়ে সর্ব্বত্রই মতভেদ ঘটে এবং তাহার মীমাংসার কোন উপায় নাই। সুতরাং সংসারে অনুক্ষণ এ নীতিপালন করা অসম্ভব।

উক্ত মত সকলের বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষার্থীরা তদ্বিষয়ক গ্রন্থপাঠে অবগত হহতে পারিবেন। তবে, তাঁহাদের জানা উচিত যে এই সকল মতের সামঞ্জস্য ও তাহাদের প্রচারিত আংশিক সত্যের পূর্ণত্ব সাধন কেবল মাত্র ঐ সর্ব্বাত্মার একত্ব উপলব্ধি দ্বারা হইতে পারে। এই মূল নীতি অবলম্বন করিলে (পাশ্চাত্য) ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধানের সহিত মানব প্রজ্ঞার বিরোধ তিরোহিত হইবে, আত্মপ্রজ্ঞাবাদীরা ব্যক্তিগত বিবেকবাণীর বৈষম্যের হেতু অবধারণ করিতে পারিবেন (জীবাত্মা সকলের ক্রমাভি-ব্যক্তির তারতম্য এবং তাহাদের ভূয়োদর্শনের ন্যূনাধিক্যই ইহার হেতু),

হিতাধিক্যবাদীরা দেখিতে পাইবেন যে যাহা সর্ব্বহিতকর নহে তাহা চরমে কাহারও নিঃশ্রেয়স্কর হইতে পারে না এবং যে নীতিশাস্ত্রে অধিকতম ও অল্পতমের স্থান নাই, কেবল সর্ব্বৈকত্ব সর্ব্বার্থপরতা ও সর্ব্বৈকলক্ষ্যতা আছে।

এই জন্য সনাতন ধর্ম্ম সেই একাত্মাবাদকে ভিত্তি করিয়া জীবাত্মা সকলের মধ্যে পরস্পরানুকুল সম্বন্ধ স্থাপন নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য করিয়াছেন। একাত্মাবাদের ফল সার্ব্বজনীন প্রেম। তাহাই পুণ্যের মূল; তদ্বিপরীত সমস্ত পাপের মূল।

সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবও (Universal Brotherhood) এই আত্মার একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবগণ তাহাদের স্থূল সুক্ষ্ম উপাধি সমূহের দ্বারা স্বতন্ত্র; বস্তুতঃ এক জলাশয়-মগ্ন ভিন্ন ভিন্ন ঘটস্থ জলের ন্যায়, মহাকাশের মধ্যস্থ বিভিন্ন ঘটাকাশের ন্যায় তাহারা একাত্মায় প্রতিষ্ঠিত— একাত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত; এই সত্য যখনই জগতে সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই যুদ্ধ বিগ্রহের অন্ত হইবে এবং সার্ব্বজনীন শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। এই তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে জাতিগত, বর্ণগত ঘৃণা ও অবজ্ঞার মূলোচ্ছেদ সাধিত হইবে এবং সর্ব্বজাতি ও শ্রেণী এক মহা মানব পরিবার ভুক্ত হইবে। এই মহা পরিবার মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবে সত্য, তবে পর বা বিজাতীয় বলিয়া (alien or foreign) কেহ থাকিবে না।

এই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব যে জগতের কেবল এক মানববংশে সীমাবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে। একই আত্মা সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বপদার্থে অনুস্যূত আছেন; তিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সুতরাং সর্ব্বভূতই এই ভ্রাতৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইবে। গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করিতেছেনঃ—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।"
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এবচ" ॥

ওহে গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়ে
আত্মা আমি সুনিশ্চয়।
আমি সে সবার আদি, মধ্য সদা
আমাতেই সব লয় ॥

তৎপরে তিনি আপনাকে সূর্য্য, চন্দ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, গো, অশ্ব, পক্ষী সর্প প্রভৃতি সর্ব্বময় বলিয়া শেষে আবার ঘোষণা করিতেছেন ঃ—

"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
নতদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরং" ॥

সর্ব্ব ভূতে যাহা বীজের স্বরূপ
আমি সে অর্জ্জুন তাই।
চরাচর মাঝে আমারে ছাড়িয়া
কভু কোথা কিছু নাই ॥

পুনঃ পুনঃ ভগবান এই মহাতত্ত্বের উপলব্ধির অত্যাবশ্যকতা ঘোষণা করিয়াছেন।

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎ স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং"

* * * * *

"যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা" ॥

(গীতা ১৩ অঃ)

বিনাশী সকলি এই বিশ্ব চরাচরে।
অবিনাশী তার মাঝে কেবল ঈশ্বর॥
তাঁরে যেই হেরে সর্ব্ব ভূতের অন্তরে।
তাঁরি সেই দেখা, দেখা, শুন অতঃপর॥
সর্ব্বত্র সমবস্থিত, পরম ঈশ্বরে।
সর্ব্ব ঘটে সম যেবা করে দরশন॥
সেই শুধু আত্মদ্বেষী নহে এ সংসারে।
অবশে পরম গতি লভে সেই জন॥

* * * * *

যখন পৃথক ভুত এক দৃষ্ট হয়।
একেরই বিস্তার সব জানেন নিশ্চয়॥
তাঁহার দেখাই দেখা, সত্য জ্ঞান তাঁর।
ব্রহ্ম পদ লাভ হয় তখন তাঁহার।

এই একাত্মত্বই সর্ব্ব সম্বন্ধের মূল। মৈত্রেয়ী অমরত্বের গূঢ় রহস্য জিজ্ঞাসা করিলে যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছিলেন—

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু
কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।"
পতি পেতে চাই বলে, পতি প্রিয় নয়।
আত্মা পেতে চাই বলে, পতি প্রিয় হয়॥

এবং পত্নী, পুত্র, সম্পত্তি, মিত্র, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এমন কি দেবগণ সম্বন্ধেও এইরূপ। এ সকল আমাদের প্রিয় কেননা এক আত্মাই আমার ও তাঁহাদের অন্তরে তুল্যরূপে বর্ত্তমান।

ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি
আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ো ভবতি।
সবার কামনা হেতু সব প্রিয় নয়।
আত্মা পেতে চাই বলে, সবে প্রিয় হয়॥

মানব এ বিশ্বের যতটুকু আপনার করিয়া লইতে পারে,—যত ভূতকে আত্মসত্বার সহিত একোপলব্ধি করিতে পারে—ততটুকুই তাহার প্রিয় হয়, ততটুকুতে তাহার মমতা হয়।

"ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতি সূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ" ॥

ননিতে ঘৃতের মত অতিসূক্ষ্মরূপে
গূঢ়ভাবে সবে বিরাজিত।
বিশ্বের সূত্রাত্মারূপে, শিবদাতা, সেই ব্রহ্মে
জেনে ছিন্নহবে পাশ যত ॥

আর অধিক শাস্ত্রবচন উদ্ধারে প্রয়োজন নাই। শ্রুতিতে পদে পদে এই মহাসত্যের ঘোষণা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই একাত্মতত্ত্বই নীতিশাস্ত্রের একমাত্র মূলভিত্তি। যেহেতু ইহাই প্রেমের একমাত্র হেতু ও আশ্রয়। একই আত্মা নানা উপাধিতে ব্যাষ্টিভাবে অবস্থিত থাকিয়া সেই একত্ব পুনরুপলব্ধির জন্য আবার সকল উপাধিকে একত্র সমাহারের চেষ্টা করিতেছেন। তাই এই বৈচিত্রময় জগতে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি দ্বারা সেই মৌলিক একত্বের পুনরুপলব্ধির চেষ্টা প্রেমরূপে বিকশিত হয়। আত্মার একত্বই প্রেমের হেতু; অনাত্ম পদার্থের বহুত্বই ঘৃণা দ্বেষ প্রভৃতি মূল কারণ। পৃথক পৃথক উপাধি নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া অপর সকলের ঘৃণা ও দ্বেষ করে। এই তত্ত্ব শাস্ত্রের গভীরতর আলোচনার সহিত স্পষ্টতর উপলব্ধি হইবে। বিশ্বে যাহা কিছু ধর্ম্ম, যাহা কিছু পুণ্য, যাহা কিছু মঙ্গল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, তাহা নিঃস্বার্থ প্রেমেরই ফল এবং আত্মার একত্ব হইতে উৎপন্ন। আর সংসারে যাহা কিছু অধর্ম্ম, যাহা কিছু পাপ, যাহা কিছু অমঙ্গল সকলই এই মহা সত্য লঙ্ঘনের ফল—তাহা উপাধি বহুত্বহেতু প্রত্যেকের আত্মা পৃথক, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফল।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার।

এই গ্রন্থের প্রথমাংশে ত্রিলোকীর বর্ণনা আছে। নূতন ত্রিলোকীর প্রারম্ভে জীববিবর্ত্ত আরব্ধ হয়। এই বিবর্ত্তন-ক্রিয়া তিন লোকেই একসঙ্গে সংঘটিত হয়। আপাততঃ আমরা কেবল ভূলোকের জীব-বিবর্ত্তনের কথা আলোচনা করিব। প্রথমে জীবোপাধির আবির্ভাব হয়। কি প্রকারে কোষের পর কোষ জীবাত্মাকে আবৃত করে, তাহা রূপকস্থলে পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে; পাঁচ প্রকার অবিদ্যাবশে (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ) ক্রমশঃ জগতের সর্ব্বভূতের বিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। এই সৃষ্টি সময়ে জীবের প্রজাবৃদ্ধির ইচ্ছা বলবতী হয়। সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রলয়কালীন তমঃ বা নিরোধ-শক্তির কিয়দংশ জীবে সংক্রামিত হয়, জীবের সেই প্রালয়িক নিশ্চেষ্টতাকে দূরীভূত করে। এই ইচ্ছা ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইলে তাহাকে প্রবৃত্তি বা বিষয়-লিপ্সা বলে। তখন জগৎ প্রবৃত্তি-মার্গানুগামী হয়।

এইরূপে জীব উপাধিবদ্ধ হয় এবং তাহাদের স্বতন্ত্রতা বুদ্ধির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বার্থান্বেষণ-প্রবৃত্তি সকল প্রবল হয়। এতদবস্থায় প্রত্যেক জীব নিজেকে একটী স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান করে এবং অন্যান্য সর্ব্বভূতকে আপনা হইতে পৃথক করিতে শিখে। মনুষ্যসকল নিজ নিজ ভোগের জন্য জীবন ধারণ করে এবং তাহারা আশু সুখের জন্যই লালায়িত

হয়। ব্যষ্টি বা বহুত্বজ্ঞান হইতে মানসিক ক্রিয়ার বিকাশ হয় এবং ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের ভাবনা আসে। মানবের স্ব স্ব বৃত্তিসমূহের স্ফূর্ত্তির জন্য এবং তাহাদের পূর্ণ বিকাশ জন্য এই স্বাতন্ত্র্যবোধক মনের আবশ্যক।

কিন্তু কিছুকাল পরে, এই স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান তাহার উন্নতির অন্তরায় হয়। ক্রমশঃ তাহাকে এই স্বাতন্ত্র্যবৃত্তিকে অতিক্রম করিতে হইবে, তাহাকে সর্ব্বাত্মার একত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে এবং যাহাতে সেই একত্বজ্ঞান বদ্ধমূল হয় এবং অবশেষে সম্পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ হয়, কার্য্যতঃ অনুক্ষণ তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই অবস্থায় মানব নিবৃত্তি-মার্গানুগামী হয় এবং ইহাকে তাহার আধ্যাত্মিক ক্রমাভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে।

অবশেষে প্রলয় আসিলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের তিরোভাব হয়। প্রবৃত্তি-মার্গের প্রায় শেষ কালে যাহা স্বাতন্ত্র্যবোধাকুল অর্থাৎ ব্যষ্টির সুখকর তাহাই কর্ত্তব্য এবং তদ্বিপরীত সকলই অকর্ত্তব্য।

তৎপরে মানব দুই মার্গের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হয় এবং বিপরীতমুখী নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। এই উভয় মার্গের সন্ধিকালে এবং তদনন্তর নিবৃত্তিমার্গে যাহা একাত্মত্বের সাধক, তাহাই পূণ্য ও কর্ত্তব্য এবং তদ্বিপরীত সকলই পাপ ও অকর্ত্তব্য।

প্রলয় উপস্থিত হইলে যাহা কিছু লয়ানুকূল, তাহাই কর্ত্তব্য এবংতদ্বি-পরীত সকলই অকর্ত্তব্য।

অতএব সাধারণ নিয়ম এই যে, জগত যখন বিবর্ত্তনের যে সোপানে বা স্তরে আরোহণ করে, যখন বিবর্ত্তন-মার্গের যে ভাগে উপস্থিত হয়, তখন যাহা কিছু সেই সোপানের ও সেই ভাগের উদ্দেশ্যসাধক, তাহাই কর্ত্তব্য এবং তদ্বিপরীত যাহা কিছু তাহাই অকর্ত্তব্য। কারণ জগৎপতির ইচ্ছা চিরদিনই জগতকে পরম মঙ্গলের দিকেই লইয়া যাওয়া। সেই

মঙ্গলময়ের ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলেই বিবর্ত্তন-স্রোতের সহায়তা ও ব্রহ্মাণ্ডের ইষ্টসাধন করা হয়। জগতপ্রবাহ বা বিবর্ত্তপ্রবাহের প্রতিকূলে গমন করিতে গেলেই প্রবল তরঙ্গাঘাতে বিধ্বস্ত হইতে হয় এবং (জলমগ্ন) শৈলাঘাতে বিচূর্ণিত হইতে হয়। কর্ত্তব্যসাধন দ্বারা ঈশ্বরের সহিত ও সর্ব্বজীবের সহিত শান্তিতে থাকা যায় এবং তাহাই প্রকৃত সুখ; আর কর্ত্তব্যলঙ্ঘন দ্বারা ঈশ্বরের ও নিজেদের সহিত বিগ্রহ ও অশান্তি উপস্থিত হয় এবং তাহাই দুঃখ। এই কারণেই অসাধু লোকে বাহ্য ঐশ্বর্য্যাদি সত্ত্বেও অসন্তুষ্ট ও বিরক্তচিত্ত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে সাধুগণের বাহ্যাবস্থা যতই মন্দ হউক তাঁহারা অন্তরে অণুক্ষণ সন্তুষ্ট ও শান্ত। এখানেও দেখা যায় যে, মূলতত্ত্বের কুত্রাপি অন্যথা নাই; কারণ ভগবানের ইচ্ছা চিরদিনই অনন্তজ্ঞান ও প্রেমবশে অনন্ত মঙ্গলের দিকে ধাবিত হইতেছে—অসংখ্য ব্যষ্টিভূতের মধ্যে কার্য্য করিয়া উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে একাত্মতা উপলব্ধি হওয়াই পরম মঙ্গল।

বিষয়টী অত্যাবশ্যক বিধায় আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

ইহার সহিত পূর্ব্ববর্ণিত বিবর্ত্তন-প্রণালীর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে; সুতরাং তাহার একটু পুনরাবৃত্তি করিতে হইতেছে। বিবর্ত্তবশেই জীবে জীবে পার্থক্য ও তাহাদের সম্বন্ধ ও অবস্থার বৈচিত্র্য। সেই বৈচিত্র্যবশেই কর্ম্মের উৎপত্তি। কর্ম্ম, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য ভেদে দ্বিবিধ। সুতরাং ঐ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রকৃতি জীবের বিবর্ত্তগত অবস্থাভেদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। উহা স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই।

বিবর্ত্ত কাহাকে বলে, তাহা আমরা উপক্রমণিকাধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। মোটামুটী বলিতে গেলে একটী ব্রহ্মাণ্ডের ও একটী জীবাত্মা

বা ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের জীবনী একইরূপ। মানবজীবনের প্রথমার্দ্ধে স্থূলদেহের উন্নতি ও শেষার্দ্ধে হ্রাস; ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষেও সেই কথা। ব্রহ্মাণ্ডজীবনের পূর্ব্বার্দ্ধে অর্থাৎ কল্পের প্রথম পরার্দ্ধে তাহার আধিভৌতিক উন্নতি সাধিত হয় এবং শেষ পরার্দ্ধে তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশ হয়। এই জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর উচ্চতর জন্ম, তৎপরে গভীরতর মৃত্যু আবার পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর জন্ম—এইরূপ অসংখ্য জন্মান্তর দ্বারা জীবের ক্রমোন্নতি সাধন, ইহাই বিবর্ত্তন বা ক্রমাভিব্যক্তির প্রক্রিয়া। আমাদের বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ডে, এই প্রক্রিয়াবশে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ক্রমে ক্রমে ধাতুরাজ্যের স্থূলতম উপাধিমধ্যে অবতরণ করে এবং তথা হইতে ঊর্দ্ধগতিবশে অর্বাকস্রোত বা উদ্ভিদরাজ্যে, পরে তির্য্যকস্রোতে বা পশুরাজ্যের মধ্য দিয়া অবশেষে ঊর্দ্ধস্রোতে মানব ও তদুচ্চ উপাধিতে ক্রমাভিব্যক্তি লাভ করিয়া চরমে মুক্তির অদ্বৈত তত্ত্বে উপনীত হয়। আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এই প্রক্রিয়াবশে মানবরাজ্যে আদিম শিশু-সরল-হৃদয় দেবতাগণ-পরিচালিত মানবজাতিসকল স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ও বিষয়লিপ্সা বৃদ্ধি প্রযুক্ত প্রত্যেকেই অন্যাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অথবা অন্যকে একবারে বঞ্চিত করিয়া একাই বিশ্বের ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তদনন্তর সেই মানবজাতি আবার শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির সোপানে আরোহন করিতে থাকে—ক্রমে তাহারা রাজার অধীন হয়, প্রথমে স্বেচ্ছাচারী রাজশাসন, পরে কঠোর সৈনিক শাসন, (military Government) অবশেষে নিয়মতন্ত্র রাজশাসনের মধ্য দিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক জীবন লাভ করে। পরে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের আবির্ভাব হইলে মানবজীবনের প্রকৃত সুখলাভ হয়; তখন তাহাদের ব্যষ্টিবোধ ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া একত্বের অনুভূতি হয় এবং

সমস্ত দুঃখের আকরস্বরূপ স্বার্থপরতা পরিহারপূর্ব্বক বিশ্বপ্রেমের ও পরার্থপরতার পরমানন্দে অধিকার হইতে থাকে। শেষে মানব জীবনে ঐ ক্রমাভিব্যক্তির প্রক্রিয়া এইভাবে পরিণত হয় যে, জন্মের পর প্রথম কয়েক বর্ষ বিবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভে (ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম), বিবাহান্তে কয়েক বৎসর পরিবার-প্রতিপালনে ও সংসারধর্ম্মে (গার্হস্থ্যাশ্রম) তদুদিতজ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিয়া, তৎপরে কিছুকাল ভাবী বংশধরগণের শিক্ষাদানে ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম (বানপ্রস্থাশ্রম) প্রতিপালনে সাহায্য করিয়া অবশেষে সংসারে বীতরাগ হইয়া যতিধর্ম্ম (সন্ন্যাসাশ্রম) অবলম্বনপূর্ব্বক মানব বিষয়ত্যাগজনিত অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করেন ও (কারামুক্তি জন্য) সুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

ইহাই মানব জাতির বিবর্ত্তনের সাধারণ ক্রম। সুতরাং যাহা কিছু এই বিবর্ত্তন প্রক্রিয়ার অনুকূল, তাহাই সৎ ও কর্ত্তব্য ; তদ্বিপরীত সকলই অসৎ ও অকর্ত্তব্য। আমাদের কোন দেশে যাইবার প্রয়োজন হইলে যে সকল যান বাহনাদির সাহায্যে ঐ গমনের সাহায্য হয়, তাহাই ভাল এবং যাহাতে প্রতিবন্ধক হয়, তাহাই মন্দ। যে যানের সাহায্যে এক বিশেষ দিকে যাওয়া যায় এবং অন্য কোন দিকে যাওয়া যায় না, তদ্বিপরীত দিকে যাইবার পক্ষে সে যান অবশ্য মন্দ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, লক্ষ্যভেদে ও অবস্থাভেদে একের পক্ষে যাহা ভাল তাহা অপরের পক্ষে মন্দ। জীবগণ যখন ক্রমাভিব্যক্তির নানা অবস্থায় আছে এবং বিবর্ত্তনের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে, তখন যাহা একের অবস্থা ও উদ্দেশ্যের অনুকূল, তাহাই হয়ত আর একজনের অবস্থা ও উদ্দেশ্যের প্রতিকূল হইতে পারে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিবর্ত্তন-চক্রের বা বৃত্তের, (Circle) প্রথমার্দ্ধ প্রবৃত্তি মার্গ ও শেষার্দ্ধ নিবৃত্তি

মার্গ। প্রবৃত্তি মার্গে জীব স্বার্থপরতা দ্বারা উপাধিনিচয়ের উন্নতি লাভ করে; নিবৃত্তি মার্গে স্বার্থত্যাগ দ্বারা জীবাত্মার ক্রমাভিব্যক্তি লাভ করে। প্রবৃত্তিমার্গে স্বার্থপরতাই কর্ত্তব্য; নিবৃত্তিমার্গে পরার্থপরতাই কর্ত্তব্য ও পুণ্য। অতএব দেখা গেল যে, সকল অবস্থায় সকল জীবের একই কর্ত্তব্য হইতে পারে না। বিবর্ত্তনের অবস্থাভেদে কাহারও বা প্রবৃত্তিমার্গ—সুতরাং স্বার্থপরতা উপযোগী; কাহারও বা নিবৃত্তিমার্গ—সুতরাং স্বার্থত্যাগই উপযোগী। অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার নির্ণয় একান্ত আবশ্যক; অথচ সকলের চরম উদ্দেশ্য এক (একাত্মার উপলব্ধি) বলিয়া সর্ব্বাবস্থায় সেদিকেও লক্ষ্য থাকা চাই। তদ্ব্যতীত প্রকৃত কর্ত্তব্যাবধারণ হইতে পারে না। সুতরাং বিশেষ বিচারপূর্ব্বক বিবর্ত্তের প্রত্যেক পর্ব্বের জন্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা নীতিবিজ্ঞানের কার্য্য।

পুরাকালের দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন ঋষিরা কৃপা করিয়া এই জ্ঞান আমাদের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদ্রষ্টা ঋষিরা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তন-ক্রিয়ার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এবং যাহাতে আমাদের ও অপরাপর সকলের—মানব ও অন্যান্য জীবসমূহের—সর্ব্বাবস্থায় অর্থাৎ ধাতু রাজ্যে, উদ্ভিদ রাজ্যে, পশু রাজ্যে, মানব রাজ্যে ও দেব রাজ্যে, সর্ব্বজীবাত্মার ক্রমাভিব্যক্তি সুখসাধ্য হয়, তদ্রূপ সাধারণ বিধি সকল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিভিন্ন ভাগে ঐ সকল বিধি বর্ণিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত বিকাশের সাহায্য হেতু চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা, সাধারণ মানব সমাজের ক্রমোন্নতির জন্য চাতুর্ব্বর্ণের ব্যবস্থা এই গ্রন্থের প্রথমাংশে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বর্ত্তমান মানবজাতির সর্ব্বপ্রকার অবস্থাই ঐ চাতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং সনাতন ধর্ম্মে মানবের সকল অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে।

স্থূলদৃষ্টিতে আধুনিক মানব-জগতের অনেক জাতি ও সমাজে এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, বিভিন্ন জাতির অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সুস্পষ্টভাবে পরিদৃশ্যমান না হইলেও সকল সমাজেই প্রকারান্তরে বা নামান্তরে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ বর্ত্তমান আছে, এবং স্পষ্টভাবে এই বর্ণাশ্রম বিভাগ গ্রহণ না করা হেতু সেই সকল সমাজকে অনেক সময় চেষ্টার নিষ্ফলতা প্রভৃতি অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে এই বর্ণাশ্রম বিধির বাহুল্য * ও অত্যাদর প্রযুক্ত বর্ত্তমান হিন্দু জাতির বিবিধ সামাজিক ও জাতীয় অনিষ্ট ও অসুবিধা ভোগ হইতেছে।

মানবের ক্রমাভিব্যক্তির বর্ত্তমান অবস্থায় মানব সমাজে স্বভাবতঃই গুরু ও শিষ্য, শাসক ও শাসিত, পণ্য উৎপাদক ও গ্রাহক, প্রভু ও ভৃত্য, পিতা মাতা ও সন্তান, স্বামী ও স্ত্রী, ভ্রাতা ও ভগিনী, কর্ম্মরত ও কর্ম্মাবসৃত (Pensioner) সৈনিক ও শাসক, কৃষক ও ব্যবসায়ী, যজমান ও পুরোহিত

* দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা বলা যাইতে পারে যে, এই বাহুল্য exaggeration, বশতঃ এক এক বর্ণমধ্যে অনেকানেক অবান্তর বিভাগের আবির্ভাব হইয়া সমাজে ঈর্ষা ঘৃণা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি করিয়াছে; সহানুভূতি ও সমবেত চেষ্টার হ্রাস হইয়াছে,; অনেক বিষয়ে শাস্ত্রবিধানের উপর দেশাচার ও লোকাচার, এমন কি "মেয়েলি আচার" ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; অনেক নিন্দনীয় 'মেয়েলি আচার' রূপ কুসংস্কার শাস্ত্রবিধান সদৃশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; আদান প্রদানের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়া সন্তানগণের শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করিয়াছে ও বিবাহাদি সংস্কা ব্যয়সাধ্য ও কষ্টকর করিয়া তুলিয়াছে; বালিকা বিবাহ ও অবরোধ প্রথার বাহুল্য বশতঃ স্ত্রীশিক্ষা এক প্রকার লোপ করিয়াছে; বিদেশ ভ্রমণ নিষেধ করিয়া শিক্ষা, ব্যবসা ও সভ্যতা বিস্তারের বিশেষ অন্তরায় হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকাণ্ডকে নানা কুসংস্কারে বিজড়িত ও আচ্ছন্ন করিয়াছে।

গৃহী ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি সম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিহার্য্য। এই সকল সম্বন্ধবশতঃ কাহার কি কর্ত্তব্য তাহা অনিশ্চিত ও পরীক্ষাসাপেক্ষ না রাখিয়া সনাতন ধর্ম্ম সেগুলিকে সুস্পষ্টভাবে নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যে অবস্থায় যাহার সম্পর্কে যেরূপ আচরণ পুণ্যপ্রদ, তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া এই আদেশ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সম্বন্ধজনিত কর্ত্তব্য সকলকে একত্র মিশ্রিত করিয়া যেন অবশেষে বিপদ ও প্রমাদকে ডাকিয়া আনা না হয় ঃ—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

(গীতা ৩য় অঃ ৩৬)

"স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে গিয়া নিধন হওয়াও ভাল অর্থাৎ নিজ কর্ত্তব্য াধনে মৃত্যুও ভাল ; পরের ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সর্ব্বথা বিপজ্জনক।"

সকলেরই স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য পালন করা কর্ত্তব্য। রাজা যদি রাজকার্য্য করিতে গিয়া বণিকের ন্যায় আচরণ করেন—রাজধর্ম্ম পালন না করিয়া যদি বণিকধর্ম্ম অবলম্বন করেন ; বিচারপতি যদি সুবিচার পরায়ণ না হইয়া সৈনিক-সুলভ শারীরিক বল অথবা ধর্ম্মোপদেষ্টার ন্যায় ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করেন ; ধর্ম্মোপদেষ্টা যদি ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া জল্লাদের বৃত্তি অবলম্বন করেন ; শিক্ষার্থী যদি বিশেষ কারণ ব্যতিরেকেও ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য অবলম্বন করেন ; ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ যদি অকারণে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন অথবা শেষোক্তেরা প্রথমোক্তের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ; যাঁহার স্বভাব সৈনিক ধর্ম্মের অনুকূল তিনি যদি বণিকবৃত্তি অনুসরণ করেন ; অথবা যিনি স্বভাবতঃ অধ্যয়নপটু, তিনি যদি কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করেন তাহা হইলে সমাজে ও রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলতা অবশ্যম্ভাবী।

যাহা এক অবস্থায় কর্ত্তব্য, অবস্থান্তরে তাহাই অকর্ত্তব্য। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এই সাধারণ সূত্র নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, "যে কার্য্য কোন সুপরিচিত বিবর্ত্তনপ্রক্রিয়ার (Scheme of Evolution) অনুকূল ও তাহার নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সাধক তাহাই কর্ত্তব্য। তদ্বিপরীত সমস্তই অকর্ত্তব্য।"

একই কার্য্য কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় (দেশ, কাল ও পাত্রভেদে) সৎ ও অসৎ, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, পুণ্য ও পাপ, দুইই হইতে পারে তাহা একটী উদাহরণ দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে। দুইটী ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইবার পর, একজন অপরকে বলপূর্ব্বক গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহার বিচরণের স্বাধীনতা হরণ করিল এবং তাহার সঙ্গে যাহা কিছু ছিল তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া নিজ অনুচরগণের হস্তে দিল। পূর্ব্বাপর বৃত্তান্তের সহিত এই কার্য্যের সম্বন্ধ না জানিলে ইহাকে অবশ্য অতি অন্যায় বলিতে হইবে; কারণ এতদ্দ্বারা সেই কারাবদ্ধ ব্যক্তির ও তাহার পরিজনবর্গের ক্রমাভিব্যক্তির ব্যাঘাত হইবে। বাস্তবিক, এরূপ কর্ম্মকে অন্যায়াবরোধ ও দস্যুতা বলা যায়। কিন্তু যদি এরূপ হয় যে, যে ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করা হইয়াছে, সে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল আর সেই অপরব্যক্তি বিচারকরূপে তাহার কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন এবং সেই চোরের নিকট প্রাপ্ত সম্পত্তি, উক্ত তৃতীয় ব্যক্তির অপহৃত সম্পত্তি জানিয়া অথবা তাহার অপহৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাহাকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ সকল কার্য্যই ন্যায়সঙ্গত ও কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু যদি ঐ অবরুদ্ধ ব্যক্তি, চুরি অপরাধে অভিযুক্ত হইলেও বস্তুতঃ এমন হয় যে, তাহার সম্পত্তি পূর্ব্বে কোন তৃতীয় ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছিল এবং পরে চোরের সন্ধান পাইয়া

বলপূর্ব্বক সে নিজ সম্পত্তি প্রতিগ্রহণ করিয়াছিল, বিচারক বিশেষ তদন্ত না করিয়াই তাহাকেই কারারুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐবিচারকের কার্য্য অন্যায় ও অকর্ত্তব্য বলিতে হইবে এবং উচ্চতর বিচারপতি কর্ত্তৃক খণ্ডনীয় হইবে। বিশ্বের বৃহত্তর জীবনে ঐরূপ ঘটনা বৃহত্তর ভাবে সংঘটিত হইয়া থাকে। পুরাণে লিখিত আছে যে, পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় মনুষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে গার্হস্থ্যধর্ম্মে ব্রতী করাই আশু উদ্দেশ্য ছিল; তজ্জন্য দক্ষ প্রজাপতি, হর্য্যশ্ব প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর সন্তানোৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে প্রজাবৃদ্ধি করিতে আদেশ করেন। কিন্তু মহর্ষি নারদ (যিনি জগতের সদসৎ শক্তিসমূহের কতক সামঞ্জস্য বিধান ও ইহসংসারে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রবর্ত্তন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন) অসময়ে তাঁহার (নিবৃত্তিমার্গের) কার্য্য আরম্ভ করিয়া দক্ষের ঐ সন্তানগণকে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। নারদের এই কার্য্য সময়ানুচিত হওয়াতে অকর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং তাঁহাকে অভিশপ্ত হইয়া আবার পশু ও মনুষ্যযোনী ভ্রমণপূর্ব্বক অন্যান্য জীবাত্মার সহিত গার্হস্থ্যাশ্রম করিতে হইয়াছিল। সুতরাং মানবজাতির প্রথমাবস্থায় রজোগুণপ্রদাতা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা পূজার আদেশ ছিল। তদনন্তর স্থিতির কারণস্বরূপ, জ্ঞান ও প্রেমের আধার, সত্ত্বগুণপ্রদাতা বিষ্ণুর পূজা তৎকালোপযোগী বিধায় প্রচলিত হয়। অবশেষে মন্বন্তরের চরমকালে প্রলয়কারণ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আকর তমঃপ্রধান শিবের পূজা প্রচলন হ[illegible] থাকে।

অতএব দেখা গেল যে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার লৌকিক অবস্থা ও অধিকারসাপেক্ষ। সর্ব্বাবস্থায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এই শ্লোকটী সকল সংস্কৃতাভিজ্ঞ হিন্দুর মুখে সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় :—

"অষ্টাদশপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ং।
পরোপকার পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নং
অষ্টাদশ পুরাণেতে ব্যাসবাক্যদ্বয়।
পুণ্য পরহিত পাপ পরাহিত হয়॥

সাধারণতঃ যখন একটী জীব অপর জীবের উপকার করে তখন সে ফলাকাঙ্ক্ষী না হইলে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার নিয়মবশে (law of action and reaction) ঐ সুখ তাহাতে (উপকারীতে) প্রত্যাবৃত্ত হয়। এইজন্য বলা হইয়াছে যে, পুণ্যের ফল সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিন প্রক্রিয়া সত্ত্ব রজঃ ও তমঃএই তিন গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে তমঃপ্রসূত প্রলয়ের নিশ্চেষ্টতা জীবাত্মার প্রাকৃতিক বা ভৌতিক উপাদানের পোষণকারী হয়। তৎপরে জীবের ভৌতিক উপাধিতে রজঃ প্রাবল্যহেতু কামনা ও মানসিক ক্রিয়া দ্বারা চিন্তাবেগসকল ও বুদ্ধি প্রবুদ্ধ হয়। অবশেষে স্বার্থানুসরণ ও বিষয় বাসনাতে বিরক্তি জন্মে এবং আমরা তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বাহ্যাবস্থানিরপেক্ষ স্থিরতম শান্তি ও আনন্দলাভে যত্নবান হই। সত্ত্বপ্রাধান্যহেতু আমাদের এই আধ্যাত্মিক বিকাশ হয়। চরমে আবার তমঃ আসিয়া আমাদিগকে অভিভব করে।

প্রত্যেক মনুষ্য সত্ত্বপ্রধান, কিম্বা রজঃপ্রধান, অথবা তমঃপ্রধান হয়। এই গুণসকলের যথাযোগ্য পরিমাণে অবস্থিতির উপর মনুষ্যের ক্রমোন্নতি নির্ভর করে। তমঃপ্রধান মনুষ্য অলস, নিরুৎসাহী, স্বল্পবুদ্ধি ও অজ্ঞ হইয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তির প্রথমে রজঃগুণ বৃদ্ধির প্রয়োজন। যে যে বিষয় তাঁহাকে বাহিরে আকৃষ্ট করে, তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপন করে এবং তাঁহাকে কর্ম্মঠ করে, তাহাই তাঁহার পক্ষে সৎ ও কর্ত্তব্য। কারণ কর্ম্মময় জীবনে সুখ ও দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধিত হইবে।

রজঃপ্রধান ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যান্বেষণে ব্যস্ত, তাঁহার বুদ্ধি উন্নত ও প্রশস্ত; তিনি সর্ব্বদা ইতস্ততঃ গমনশীল; তাঁহার বিষয়-লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তৎপূরণার্থ তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বতোমুখী হয়। কর্ম্মশীলতা তাঁহার স্বভাবের প্রধান গুণ, তাঁহার সকল কর্ম্মের কেন্দ্র তাঁহার পার্থিব জীবন; রাগ (বিষয়ানুরাগ) ও দ্বেষ তাহাকে সর্ব্ব কর্ম্মে প্রনোদিত করে।

যখন সত্বগুণ প্রবল হয় তখন মনুষ্য স্বার্থসেবার অপকৃষ্টতা, পার্থিব কামনার নশ্বরত্ব, এবং ইহলোকের সর্ব্বকর্ম্মের উৎকণ্ঠা ও অশান্তি উপলব্ধি করেন। তখন তিনি সর্ব্ববিষয়ে ধীরভাবে ও দূরদৃষ্টিসহযোগে আলোচনা করেন। তখন শান্তিপথের পথিক হইয়া সকল বিষয় আধ্যাত্মিক চক্ষে দর্শন করেন। সদসৎ, নিত্যানিত্য বিচার পরায়ণ হইয়া সর্ব্ব বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। ধ্রুব ও অধ্রুব বিষয়ের, ক্ষণিক ও অনন্ত সুখের পার্থক্য জানিয়া তিনি পরাশান্তি ও আনন্দ উপভোগ করেন।

এইরূপ প্রত্যেক মনুষ্য স্বীয় ক্রমাভিব্যক্তির পদে (Stage of evolution) অবস্থিত আছে। ইহা তাহার জন্মকালীন অবস্থাসমূহ দ্বারা এবং তাহার চরিত্র ও বৃত্তিগণ দ্বারা সুচিত হয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি এখন ক্রমাভিব্যক্তির কোন্ পদে (in what stage of evolution) অবস্থিত আছেন জানিতে পারিলে, তিনি কিরূপ শিক্ষা, দীক্ষার যোগ্য বা অধিকারী এবং কোন মার্গে ও কি প্রণালীতে তাঁহার নৈতিক উন্নতি সাধন সহজসাধ্য তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহাকে অধিকারী তত্ত্ব বলে। বর্ণাশ্রমভেদ এই অধিকারী ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্যের আত্মার (Ego or Soul) অধিকার অনুসারে বর্ণভেদ হয় এবং তাহার বর্ত্তমান ব্যক্তিত্বের (present personality) অধিকার অনুসারে তাহার আশ্রমধর্ম্ম নির্ণীত

হয়। যদিও বর্ণাশ্রমানুসারে মানবের প্রত্যেক অবস্থার উপযোগী নিয়ম সকল বর্ণাশ্রমধর্ম্মে বিধিবদ্ধ আছে, তত্রাপি সাধারণ সভ্য মনুষ্যসকলের জন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এইগুলিকে নীতিবিজ্ঞানের সাধারণ বিধি বলা যায়।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, উপরে যে সকল বিষয় ব্যাখ্যাত হইল, কিরূপে সেই ভিত্তির উপর এই অত্যাবশ্যক নীতিবিজ্ঞান বা আচার-বিজ্ঞান গঠিত হইতে পারে।

নীতিবিজ্ঞানের সহিত মানবের সুখ ও শান্তির যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা অনুধাবন করিলে ইহার চর্চ্চা যে প্রত্যেক মনুষ্যের নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহা প্রতীত হয়। বিশেষতঃ যুবকগণের পক্ষে ইহার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে অত্যুক্তি অসম্ভব ; যেহেতু তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গলামঙ্গল ইহার উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে। মানবের চরিত্র তাহার জীবনের—কি আন্তরিক কি বাহ্যিক,—সুখদুঃখের হেতু। ধর্ম্ম ও সুখ একসূত্রে গ্রথিত এবং পার্থিব জীবনে চরিত্রই এতদুভয়ের হেতুভূত বলিয়া চরিত্রবান লোকই জগতে কৃতকার্য্য হয়। তীক্ষ্ণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি কিছুকাল কৃতকার্য্য হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র মন্দ হইলে আর কেহ তাঁহাকে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিবে না। সংসারের সর্ব্বকার্য্যক্ষেত্রে চরিত্রই মনুষ্যের প্রধান সম্বল ; যাঁহার চরিত্র উত্তম ও আদর্শস্থানীয় সকলেই তাঁহাকে মান্য ও প্রশংসা করে।

কৌমার ও যৌবনকাল চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময়। এই সময়ে পাপের অঙ্কুর সকল সমূলে উন্মূলিত এবং সদ্গুণের বীজ বপন করিবার উপযুক্ত সময়।

প্রত্যেক ব্যক্তিই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত চরিত্র লইয়া জন্মগ্রহণ করে ; ইহা

তাঁহার স্বকৃত বন্ধু বা শত্রু এবং ইহারই উপর তাঁহাকে ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত করিতে হইবে। মানব, নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনোপায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে, ঐ চরিত্রকে তদানুকূলে পরিচালিত করিতে পারে। মানবের নিজ দোষ ও গুণের মূল বুঝিতে পারা আবশ্যক। ইহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইলে কুপ্রবৃত্তির নাশ ও সুপ্রবৃত্তির উদ্বোধনপূর্ব্বক, কর্ম্মঠ উদ্যান-পালের ন্যায় কুমতিরূপ কণ্টক বৃক্ষের নাশ করিয়া সুমতিরূপ কল্পবৃক্ষের স্থাপনা করা যায়। মানবের হৃদয় তাহার হৃদয়েশ্বরের প্রমোদ উদ্যান এবং মানব তাহার উদ্যানপাল। যাহাতে সেই প্রমোদ উদ্যানটী কণ্টকাকীর্ণ না হয়, প্রত্যুত যাহাতে ঐ উদ্যান নিত্য নব সৌন্দর্য্য ও সৌরভের আধার হইতে পারে, সুদক্ষ উদ্যানপালের ন্যায় মানবের তজ্জন্য যত্নবান হওয়া উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের আদর্শ বা প্রমাণ।

জগতের ক্রমাভিব্যক্তির বর্ত্তমানাবস্থায় যে আদর্শ বা প্রমাণের দ্বারা কোন কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা বিচার করা উচিত তাহা ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। যে কার্য্য জগতের একাত্মতাজ্ঞানের উদ্বোধক তাহাই কর্ত্তব্য তাহার প্রতিকূল সকল কার্য্যই অকর্ত্তব্য।

সর্ব্বথা আত্মার একত্ব উপলব্ধিই, বিবিধ উপাধির মধ্যে এক অদ্বয়াত্মার অনুভূতিই, বর্ত্তমান সময়ে বিবর্ত্তন ব্যাপারের উদ্দেশ্য। সুতরাং যে পথ অদ্বৈতজ্ঞানে লইয়া যায়, তাহাই সাধুমার্গ, তাহাই সত্য পথ। নীতিশাস্ত্র জ্ঞানের উদ্বোধক ও পার্থক্যবুদ্ধির নিষেধক। ব্যষ্টি জীবাত্মাসকলকে কেবল প্রেমবন্ধনে একত্বে লইয়া যাওয়া যায়। এই কারণেই প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বভূতের মধ্যে পরস্পরানুকূল সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা, প্রকৃত সুখ ও শান্তি বিধান করাই নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

যেমন একটী মানবদেহের অঙ্গ দ্বারা প্রত্যঙ্গসকল পরস্পরানুকূল ভাবে কার্য্য করিয়া তাহাদের (ব্যষ্টির ও সমষ্টির) সর্ব্বাঙ্গীন ইষ্টসাধন করে, তেমনি সমগ্র মানবজাতিরূপ বিরাট মানবদেহের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সকলকে পরস্পরানুকূল ভাবে কার্য্য করিতে শিখাইয়া তাহার (ব্যষ্টির ও সমষ্টির) সর্ব্বাঙ্গীন ইষ্টসাধনই নীতিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সর্ব্বজাতী সর্ব্বসমাজের মানবগণ যে একই বিরাট মানবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, একথা রূপক নহে।

অবশ্য "পুরুষ" অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামি আত্মা বা পুরুষই, পুরুষোত্তম বা ঈশ্বর। সেই পুরুষোত্তমের বিরাট দেহকেও পুরুষ বলা যায়; সমগ্র মানব জাতির সমষ্টিই সেই পুরুযোত্তমের বিরাট মানবদেহ এবং এক একটী স্বতন্ত্র জীব সেই বিরাট পুরুষের দেহস্থ এক একটী কোষাণু জীবাণু বা ceoll মাত্র। যুদ্ধ, কলহ, দৈন্য, দুর্ভিক্ষ্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দুর্ব্বলের নাশ প্রভৃতি সংসারে যে অসংখ্য দুর্দ্দৈব আছে—যাহা কিছু মনুষ্যের দুঃখের হেতুভূত—সে সকলই এই বিরাট পুরুষের ব্যাধি। সেই বিরাট দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গসকলের স্বাস্থ্যহানি নিবন্ধন অর্থাৎ তাহাদের স্বধর্ম্ম লঙ্ঘন নিবন্ধন সমষ্টির হিতপরায়ণ না হইয়া ব্যষ্টির স্বার্থান্বেষণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু—এই সকল ব্যাধির উৎপন্ন হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে মনুষ্য স্বভাব দ্বিবিধ, এই দুইটী দৈবী ও আসুরী সম্পৎ নামে অভিহিত। প্রত্যেক মনুষ্য এই দ্বিবিধ সম্পদের অন্যতরকে আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করে।

যে সকল গুণ দ্বারা সর্ব্বজীবের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতি বর্দ্ধিত হয়—যাহারা মিত্রতা ও ঐক্যের অনুকূল—যদ্বারা শান্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠিত হয়—এক কথায়, যাহারা বিবর্ত্তন বিধির অনুকূল, সেইগুলি দৈবী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। ভগবান বলিতেছেন :—

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবং॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়া ভুতেস্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলং॥
তেজ ক্ষমা ধতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভীজাতস্ত ভারত"॥

(গীতা ১৫ অঃ) ১-৩

ভয়ের অভাব আর সত্ত্ব শুদ্ধাচার।
জ্ঞানযোগে স্থিরভাবে অবস্থিতি যার।।
দান আর ইন্দ্রিয়গণের সংযমন।
যজ্ঞ, বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা সাধন।।
সরলতা, হিংসাভাব, সত্যের আশ্রয়।
ক্রোধের অভাব, ত্যাগে নিষ্ঠা অতিশয়।।
সদা শান্তচিত্ত, পরচর্চ্চায় বিরাগ।
সর্ব্বজীবে দয়া, লোভহীন, মৃদুভাব।।
প্রশংসায় কদাচারে লজ্জা অতিশয়।
অচাঞ্চল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ চয়।।
ঘৃণা ও জিঘাংসা নাই, নাই অভিমান।
দৈবী এ সম্পদচয় লভে পুণ্যবান।।

ইহার বিপরীত ভাব বা দোষসমূহকে তিনি আসুরী সম্পৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সমুদয়ের দ্বারা জীবগণের ভেদভাব সঞ্জাত হয়, অহঙ্কারের বৃদ্ধি হয় ও দেহাভিমান দৃঢ়তর হয়। দ্বৈতবুদ্ধি হইতে যে সকল মায়িক ভাবের উদয় হয়, তাহাদিগকে তিনি আসুরী সম্পদের মূল বলিয়াছেন। যথাঃ—

"দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীং॥"

(গীতা ১৬ অঃ)

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ কর্কশতা।
আসুরী সম্পদে জন্মে আর যে অজ্ঞতা॥
আত্মসম্ভাবিতা স্তব্ধা ধনমান মদান্বিতা।
যজান্তে নাম যজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধি পূর্ব্বকং॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতা।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥

*　　*　　*　　*

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভ স্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥

(গীতা ১৬ অঃ)

আপনিই আপনারে বড় বলি মানে।
কাজেই অনম্র সদা মত্ত ধন মানে ॥
নাম মাত্র যজ্ঞ করে বিধিকে ছাড়িয়া।
কেবল দম্ভের বশে, নামের লাগিয়া ॥
অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ আর।
এসব আশ্রয়ে মত্ত মানস তাহার ॥
দ্বেষ করে মোরে সদা দম্ভভাব ধরি।
নিজদেহে, পরদেহে পীড়া দান করি ॥

*　　*　　*　　*

নরকের দ্বার তিন শুন দিয়া মন।
আত্মনাশ ঘটে যাহে নরক গমন ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, তিন অতীব দুর্ব্বার।
মানবের উচিত এ তিন পরিহার ॥

ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায় যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করিলে এই বিষয়টী উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

সদ্‌গুণ ও তাহার ভিত্তি।

পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ ব্যতীত সর্ব্বজনীন প্রীতি ও সহানুভূতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আত্মসুখত্যাগ না করিলে পরকে সুখী করিতে পারা যায় না। আত্মসংযম ও পরার্থ-পরতা, একপ্রাণতা সাধনের প্রধান উপায়। এই মূলমন্ত্র প্রত্যেকের হৃদয়ে অনুভব করিতে হইবে যে, সর্ব্বজীবই এক বিরাট পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র এবং প্রত্যেকের জীবন সেই বিরাট পুরুষের জীবনের অনুগত ও উপযোগী করিতে হইবে। একটী দেহে অসংখ্য কোষাণু বা জীবাণু (Cell) আছে এবং প্রত্যেক জীবাণুর স্বতন্ত্র প্রাণশক্তি আছে, কিন্তু প্রত্যেক জীবাণুর প্রাণশক্তি যেমন ঐ দেহের সর্ব্বব্যাপী প্রাণশক্তির পোষক ও অনুগামী করে, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের জীবনকে বিশ্বব্যাপী ঐশ্বরিক জীবনের অনুগামী ও উপযোগী করিতে হইবে। দেহের ভিন্ন ভিন্ন জীবাণু ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত আছে, কিন্তু প্রত্যেকের কার্য্য দেহের সাধারণ কার্য্যেরই অংশ ও তদনুগামী। যেরূপ প্রত্যেক জীবাণুর ঐ দেহে এক একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান ও ক্রিয়া আছে, সেইরূপ ঈশ্বরের বিরাট দেহে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক জীবের এক একটী নিরূপিত স্থান ও ক্রিয়া আছে। এক মহাপ্রাণ সর্ব্বজীবকে অণুপ্রাণিত করিতেছে—সর্ব্বজীবের অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে; সুতরাং প্রত্যেকের প্রাণকে সেই বিশ্বপ্রাণের, সেই ঐশ্বরিক মহাপ্রাণের অনুসরণ করিতে হইবে। আমরা সকলেই এই নিয়মের অধীন, এই বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং

এই বিধিই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র, আমাদের আধ্যাত্মিক নীতি ; সকল জীবই এই মূলসূত্র দ্বারা পরস্পরের সহিত গ্রথিত এবং সেই হেতু পরস্পরের সাপেক্ষ। এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়াই পরস্পরের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে ও পরস্পরের সহায়তা করিতে বাধ্য। সকল জীবই পরস্পরের সাহায্যাপেক্ষী ও অধীন এবং তাহারা সকলেই এক ঐশ্বরিক জীবনের অধীন। এই পরস্পরের সাপেক্ষতা হেতু পরস্পরের জন্য স্বার্থত্যাগ পরস্পরের জন্য আত্মোৎসর্গই যজ্ঞনামে অভিহিত। এই যজ্ঞতত্ত্ব গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে।

আমরা যে কোন কার্য্য করি, সে সমস্তই যজ্ঞার্থে (যজ্ঞপুরুষের উদ্দেশে) করা উচিত। এই উপায়েই কেবল আমরা সেই ঐশ্বরিক মহাবিধির অনুগামী হইতে পারি। যিনি কেবল স্বার্থান্বেষণে জীবন যাপন করেন, যিনি বিশ্বকেন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া নিজে স্বতন্ত্র কেন্দ্র হইতে চেষ্টা করেন, তিনি কেবল নিজের বন্ধন জন্য শৃঙ্খল সৃষ্টি করিয়া তাহার ফল-ভোগী হন।

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর" ॥

(গীতা ৩য় অঃ ৯)

যজ্ঞার্থ করিয়া কর্ম্ম, তরে জীবগণ।
আর সব কাজ ভবে বন্ধন কারণ॥
অতএব হে কৌন্তেয় কর সব কাজ।
যজ্ঞার্থ নিষ্কাম ভাবে হবে মুক্তিলাভ।

ব্রহ্মাণ্ডে পাঁচ শ্রেণীর জীব পরস্পরের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধ—যথা দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, নরগণ ও পশুগণ এবং তাঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করা প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। কারণ যজ্ঞ যখন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, যখন শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে তখন তাহার অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য।

নীতিবিজ্ঞানের অর্থে "কর্ত্তব্য" বলিতে এই বুঝায় যে, যে কার্য্য আমাদের দেনা আছে, তাহা করা বিধেয় এবং যাহা দেয়, আছে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। প্রকৃতি নিরন্তর গুণকর্ম্মজনিত অক্ষোভণের সমতা ও সামঞ্জস্য বিধান করিতেছেন। ইহাই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া (action and reaction সম্বন্ধীয় কার্য্যকারণ বিধির (Law of Karmo) সহ মূলতথ্য। প্রকৃতি নিয়তই জমা ও খরচের সমতা রক্ষার জন্য ব্যস্ত। কর্ত্তব্য বলিলে, এক জনের অপরের নিকট কর্ম্মবিষয়ক ঋণ বুঝায়; পূর্ব্বে তাহার (শেষোক্তের) নিকট যে উপকার পাইয়াছেন, তাহারই প্রতিদান বুঝায়।

দৈনিক পঞ্চযজ্ঞ সম্বন্ধে পাঁচটী কর্ত্তব্য উল্লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে তিনটী একটু বিশেষ ও বিস্তৃতভাবে ঋণ শব্দবাচ্য, যেহেতু উহার প্রতিদান-বিধি মনুষ্যের আজীবন পালনীয়। এই ঋণত্রয়কে ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও দেবঋণ কহে।

"অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ" ॥

মনু ৬ : ৩৬

বিধিমত বেদশাস্ত্র করি অধ্যয়ন।
ধর্ম্মতঃ করিবে পরে পুত্র উৎপাদন॥
যথাশক্তি যজ্ঞদান করি তারপর।
নিঃশ্রেয়স মোক্ষলাভে হইবে তৎপর।

দ্বিজবর্ণত্রয়কে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) ত্রিবিধ আশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ) এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, অধ্যাপন ও গুরুসেবা দ্বারা ঋষিঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। পরে গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক যথাবিধি পুত্রোৎপাদন ও দানাদি অন্যান্য গার্হস্থ্যধর্ম্ম

পালন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হইবেক। অনন্তর বানপ্রস্থাশ্রয়-পূর্ব্বক যজনাদি দ্বারা প্রধানতঃ দেবঋণ পরিশোধ করিবে। চরমে সন্ন্যাসাশ্রমে উন্নত নিষ্কাম ভাবে উক্ত ত্রিবিধ আশ্রমের সারধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক মোক্ষানুসন্ধান করিতে হয়। শূদ্রবর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তি বিষয়ে কনিষ্ঠ বলিয়া তাহাদের জন্য সকল কর্ত্তব্যের সার সর্ব্বফল-দাতা সেবাধর্ম্ম বিহিত আছে। এই প্রকারে কনিষ্ঠেরও যাহার কর্ত্তব্য, সর্ব্ব জেষ্ঠেরও তাহাই কর্ত্তব্য বিহিত হইয়াছে; কেবল জ্যেষ্ঠ তাহা উন্নত নিষ্কাম ভাবে সম্পাদন করিবেন।

পিতা পুত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্ত্তব্যবিধির অর্থ একটু বিশদ করা যাইতে পারে। পিতা নিজ শৈশবে তাঁহার জনক জননীর কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট ঋণী হইয়াছেন। পিতামাতার ঋণ অপরিশোধ্য হইলেও, মানব সন্তানোৎপাদন ও লালন পালন দ্বারা এবং পিতামাতার বৃদ্ধাবস্থায় পালন ও সেবা দ্বারা তাহা পরিশোধের জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করা একান্ত বিধেয়। সন্তান পিতামাতার নিকট দেহপ্রাপ্ত হন; সুতরাং ঐ দেহ দ্বারা যতদূর সম্ভব তাঁহাদের সেবা করা সন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য। নিরাশ্রয় মানব শৈশবাবস্থায় পিতামাতা কর্তৃক যে ভাবে লালিত পালিত হন, তাহা নিজ সন্তানের যথোচিত লালন পালনের দ্বারা প্রতিদান করা আবশ্যক।

যে বৃত্তি প্রভাবে মানব কর্ত্তব্যপালনে তৎপর হয়, তাহাকে সদ্‌গুণ কহে, এবং যদ্দ্বারা তল্লঙ্ঘনে প্রণোদিত হয়, তাহাকে দোষ বা পাপ কহে। দুইটী জীবের মধ্যে যে সম্বন্ধ বশতঃ পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যের উৎপত্তি হয়, সেই সম্বন্ধানুসারে পরস্পরের কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হইলেই অর্থাৎ তদুপযোগী সদ্‌গুণ অবলম্বন করিলেই সুখ জন্মে;

এবং তাহাদের উভয় বা অন্যতর দ্বারা তদনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলেই অর্থাৎ সেই কর্ত্তব্য সাধনে অনিচ্ছাজনক দোষাশ্রয় করিলেই দুঃখ জন্মে। যদি পিতা সন্তানকে স্নেহ করেন, লালন পালন করেন ও পিতার সর্ব্বতোভাবে তাহার হিত সাধনে যত্নবান হন এবং সন্তানও যদি আজ্ঞাবহ হন এবং তাঁহার সেবা ভক্তি পরায়ণ হন, তবে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ অতিশয় সুখের হয়। পক্ষান্তরে পিতা যদি কর্কশস্বভাব হন, সন্তানকে উৎপীড়ন করেন বা তুচ্ছ তাচ্ছল্য করেন এবং সন্তানও যদি পিতাকে ভক্তি না করে, পিতাকে অবজ্ঞা করে ও পিতার অবাধ্য হয়, তাহা হইলে (উভয়ের ঐ সকল দোষাশ্রয় হেতু) পিতাপুত্র সম্বন্ধ উভয়েরই দুঃখজনক হয়। যদি পিতা পুত্র পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসেন, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধ জনিত সদ্‌গুণ সকল অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু যদি পিতাপুত্রের পরস্পর ভালবাসা না থাকে, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধ জনিত দোষ সমূহ আচরিত হইবে। একত্ব-বোধ-প্রবণ সাধুবুদ্ধি পরিচালিত ভালবাসা হইতে সদ্‌গুণের উৎপত্তি হয় এবং পার্থক্য-বোধ-প্রবণ দুর্বুদ্ধি পরিচালিত অশ্রদ্ধা বা অপ্রীতি হইতে অসদ্‌গুণ বা দোষের উৎপত্তি হয়।

পাপ পুণ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, সদাচার অসদাচার আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মানবজীবনে তাহারা যেভাবে প্রকট হউক না কেন, তাহারা সকলেই একই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যই জগতের একমাত্র মূলমন্ত্র বা মহাবিধি (Great Law)। আত্মোৎসর্গরূপ যজ্ঞ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ঐ মহাবিধির অনুগামী; এবং সত্যের প্রকটভাবই মহাবিধি। সত্য ঈশ্বরেরই নামান্তর। ভগবান যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, তখন দেবতারা এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন :—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনীং নিহিতং চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃত সত্য নেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রাপন্না ॥

বিষ্ণু ভাগবৎ ১০।২৯

জয় সত্যব্রত জয় সত্যপর
ত্রিসত্য সত্যের মূল।
সত্যে নিহিত তুমি সত্যময়
নাহি কিছু তাহে ভুল ॥
সত্যের সে সত্য ঋত-সত্য নেত্র
সত্যাত্মক দয়াময়।
সত্যের ভিখারী আমরা সকলে
লইনু পদে আশ্রয় ॥

এই হেতু সদ্‌গুণ সকলকে সত্যেরই প্রকান্তর বলা হইয়াছে। ভীষ্মদেব বলিয়াছেন :—

সত্যং চ সমতা চৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ।
অমাৎসর্য্যং ক্ষমা চৈব হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়তা ॥
ত্যাগো ধ্যানমথার্য্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং দয়া।
অহিংসা চৈব রাজেন্দ্র সত্যাকারাস্ত্রয়োদশ ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৬২)

সত্য সে সমতা, দম, অমাৎসর্য্য আর।
ক্ষমা, লজ্জা, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ যে ঈর্ষার ।।
ত্যাগ, ধ্যান, আর্য্যভাব, ধৃতি, দয়া আর।
অহিংসা এ ত্রয়োদশ হয় সত্যাকার ।।

যাহা আছে তাহাই সত্য। ঐ অধ্যায়েই ভীষ্মদেব আরও বলিতেছেন—

সত্যং ব্রহ্ম সনাতনং।
সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং ॥

"সত্যই সনাতন ব্রহ্ম"। "সত্যেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত"। প্রত্যেক নৈসর্গিক বিধিই সত্যের প্রকট ভাববিশেষ, অর্থাৎ যিনি "তৎসৎ" পদবাচ্য যিনিই সত্য এবং একমাত্র সদ্বস্তু, যিনি অনাত্ম,অসত্য, অসৎ মূলপ্রকৃতির বিধিনিষেধের মধ্যে আত্মা বা পুরুষরূপে প্রকট হন, সকল প্রাকৃতিক বিধিনিষেধই তাঁহার স্বভাবের বিকাশ। তাই এই বিধিনিষেধ সকল সম্পূর্ণ অমোঘ ও অখণ্ডনীয় এবং অতিসূক্ষ্ম ন্যায়পরায়ণ। ঐ সকল বিধিনিষেধ অনুবর্ত্তনেই সত্যাচরণ হয় এবং তাহা হইলে প্রকৃতির সৃজন বা উদ্বোধনী শক্তি আমাদের অনুকূলে কার্য্যকারিণী হয়। ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তিতা। আমাদের বুদ্ধি সদসৎ নিত্যানিত্য বিচারক্ষম এবং যে সকল বৃত্তিদ্বারা বাহ্য জগতের জ্ঞান আত্মগত করিয়া মানব নিজ চরিত্র ও প্রবৃত্তির পুষ্টিসাধন করে ; এই প্রাণশক্তিই তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে। এইরূপে পাপপুণ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, হিতাহিত ভাব সকল মনুষ্যের মনে অঙ্কিত হয়।

সৎ পদার্থকে ধ্রুব ও নিত্য উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধি তাহাকেই ধরিতে চায় এবং তাহা হইতে ই সত্যেররূপান্তর বা সত্যস্বরূপ সদগুণ সকলের সন্মার্গগামী হয়, অর্থাৎ সত্যের রূপান্তর বা সত্যস্বরূপ সদ্‌গুণ সকলের অনুশীলন আসে।

যাহা নাই তাহাই মিথ্যা অর্থাৎ কোনকালেই যাহার যথার্থ সত্ত্বা নাই তাহাই মিথ্যা ও অসৎ।

গুণ সকল যেমন সত্যের রূপান্তর, দোষ সমূহ তেমনি মিথ্যার রূপান্তর। সত্য একটী স্বতন্ত্র গুণ নহে ; প্রত্যুত ইহা সমস্ত সদ্‌গুণেরই আকর, ভিত্তি ও মূল উপাদান। এই জন্য সত্যনিষ্ঠা এত অত্যাবশ্যক।

প্রাচীন কালে সত্যনিষ্ঠাই আর্য্যদিগের (প্রধান গুণ) বিশেষত্ব ছিল এবং বীরত্বের প্রধান উপাদান বলিয়া পুনঃ পুনঃ উক্ত

হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যুর মৃত পুত্রকে জীবিত করিবার সময় বলিয়াছিলেন :—

"ন ব্রবীম্যুত্তরে মিথ্যা সত্যমেতদ্ভবিষ্যতি।
এষ সংজীবয়াম্যেনং পশ্যন্তাং সর্ব্বদেহিনাং ॥
নোক্ত পূর্ব্বং ময়া মিথ্যা স্বৈরেষপি কদাচন।
ন চ যুদ্ধাৎ পরাবৃত্তস্তথা সংজীবতাময়ং ॥

*　　*　　*　　*

যথাহং নাভিজানামি বিজয়েন কদাচন।
বিরোধন্তেন সত্যেন মৃতো জীবত্বয়ং শিশুঃ ॥
যথা সত্যং চ ধর্ম্মশ্চ ময়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ।
তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবতামভিমন্যুজঃ ॥

(মহাভারত অশ্বমেধ ৬৯)

শুনহ উত্তরে　　মিথ্যা নাহি বলি
সত্যই ঘটিবে ইহা।
এই মৃত শিশু　　বাঁচাব এখনি
দেখুক সকলে তাহা ॥
ক্রীড়াছলে কভু　　মিথ্যা নাহি বলি
নহি যুদ্ধে (কভু) পরাঙ্মুখ।
অতএব কভু　　বৃথা না হইবে
অব্যর্থ বচন মোর ॥
বাঁচিবে এ শিশু　　দেখিবে সকলে
কোলে যাবে পুত্র তোর ॥

*　　*　　*　　*

অর্জ্জুনের সনে　　বিরোধ বিরাগ
কভু নাহি জানি আমি।
সেই সত্য বলে　　ফলেতে তাহার
বাঁচিবে শিশু এখনি।

সত্য আর ধর্ম্ম নিরন্ত আমার
আছে সদা প্রতিষ্ঠিত।
তা সবার বলে বাঁচিবে এখনি
দেখ, অভিমন্যুসুত ॥

আরও কত বীর পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "আমার রসনা কথনও মিথ্যা-বাক্য উচ্চারণ করে নাই।" পাছে পিতার বাক্য মিথ্যা হয়, তাই শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইয়াছিলেন। সত্য রক্ষার জন্য যুধিষ্ঠির প্রতিশ্রুত বনবাস ও অজ্ঞাতবাস শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নিজরাজ্যের জন্য যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

ভূয়োভূয়ঃ এইরূপ উপদেশ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের ফলে আর্য্য চরিত্রে সত্যনিষ্ঠা বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছিল এবং ইহা হিন্দু চরিত্রের বিশেষত্ব বলিয়া পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে ॥

যাহার সত্যে আস্থা নাই, যাহার চরিত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সে কথনও পুণ্যচরিত্র হইতে পারে না; পক্ষান্তরে যিনি কথনও সত্যের অপলাপ করেন নাই, তিনি কখনও দুশ্চরিত্র হইতে পারেন না। সত্যই মনুষ্যত্বের মূল, বীরের গৌরব, ধার্ম্মিকের মুকুটমণি, পরিবারের পালক ও রাজ্যের রক্ষানিদান। মিথ্যা দ্বারা গৃহ, সমাজ ও রাজ্য উৎসন্ন যায়, সদ্গুণের মূলোচ্ছেদ হয় এবং মানব চরিত্র অপবিত্র ও পাপপ্রবণ হয়। মিথ্যাবাদী সদাই দুর্ব্বল ও ঘৃণার্হ; বিদ্রূপ, লজ্জা ও ঘৃণা সদাই তাহার অনুসরণ করে। সত্যই চরিত্র গঠণের একমাত্র মূলভিত্তি।

এখন বুঝা গেল কেন পূর্ব্বে সত্যকে সুনীতির মূল ও ভিত্তি বলা হইয়াছে। কারণ মিথ্যাচরণের মূলান্বেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, স্বতন্ত্র ও আত্মসুখসেবী (সুতরাং পরার্থবিমুখ) জীবন যাপনোদ্দেশেই

লোকে মিথ্যার আশ্রয় লয়। ভেদজ্ঞান, অপ্রেম ও ঘৃণাই এরূপ অভিলাষের মূল। পক্ষান্তরে সর্ব্বজীবের জীবন, সর্ব্বপ্রেমের আকর, সেই সর্ব্বময় পরমাত্মার জীবনে জীবন মিশাইবার আশায় জ্ঞানীগণ সত্যাচরণ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আনন্দ ও হৃদয়াবেগ।

ঈশ্বরের প্রাণশক্তি সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত আছে অর্থাৎ সর্ব্বভূতই সেই প্রাণশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। ঐ ঐশ্বরিক প্রাণশক্তি ভূতসকলে চৈতন্য ও আনন্দ রূপে প্রতিভাত হয়। ভূতগণের উপাধির প্রতিস্পন্দন শক্তির তারতম্যানুসারে, ঐ প্রাণ শক্তির (চৈতন্য ও আনন্দরূপে) প্রকাশের তারতম্য হয়। [পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জড়ের সাহায্য বিনা কোন শক্তিই প্রকট হইতে পারে না। জড় পদার্থের আশ্রয় না লইলে, জড় মধ্যগত না হইলে, কোন শক্তিই প্রকাশ পাইতে পারে না। শক্তি কখনও ইন্দ্রিয় গোচর হয় না; শক্তির ক্রিয়াই ইন্দ্রিয় গোচর হয়। ক্রিয়ার জন্য উপাধি চাই। উপাধি ব্যতিরেকে শক্তি কি প্রকারে কার্য্য করিবে? সকল উপাধি কিন্তু সমান ভাবে আত্মার প্রাণশক্তির প্রতিস্পন্দন (power of responding to vibration) করিতে পারে না। উপাধিগণের ক্রমবিকাশের অল্পাধিক্যবশতঃ তাহাদের এই প্রতিস্পন্দন শক্তির ন্যূনাধিক্য ঘটে। ধাতু উপাধিতে (mineral body) প্রাণশক্তির ক্রিয়া অত্যল্পই লক্ষিত হয়; উদ্ভিদরাজ্যে তাহার ক্রিয়া স্পষ্ট ইন্দ্রিয় গোচর হইলেও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; পশুরাজ্যে এই ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক এবং মনুষ্যে এই প্রাণের ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও বহুমুখী। সুতরাং ভৌতিক উপাধির প্রতিস্পন্দন শক্তির তারতম্যানুসারে, তদন্তরস্থ প্রাণশক্তির (চৈতন্য ও আনন্দ রূপে) প্রকাশের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।] জীবগণ ক্রমাভিব্যক্তির

পথে যতই অগ্রসর হয়, ততই তাহাদের দেহ সকল বহু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট ও জটিলতর হয় এবং তাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম স্ফুটতর হয়; সুতরাং তন্মধ্যে আবদ্ধ প্রাণশক্তি অধিকতর কার্য্যকারী হয়। প্রাণশক্তিই ভূত সমূহকে ক্রমাভিব্যাক্তির পথে পরিচালিত করে। এই শক্তিই ধাতু উপাধির (Mineral body) তামসিক নিশ্চেষ্টতা দূর করিয়া ধাতুকে উত্তরোত্তর অধিক নমনীয় করে ও বাহ্যবস্তুর গুণ গ্রহণে (প্রতিস্পন্দনে সমর্থ) করে। এই ঐশ্বরিক প্রাণশক্তি অবশেষে প্রত্যেক জীবের অন্তরে আত্মার কেন্দ্র বা কেন্দ্রাত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং যে সকল বৃত্তিদ্বারা বাহ্য জগতের জ্ঞান আত্মগত করিয়া মানব নিজ চরিত্র ও প্রবৃত্তির পুষ্টিসাধন করে, এই প্রাণ শক্তিই তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে। এইরূপে পাপপুণ্য, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য, হিতাহিত ভাব সকল মনুষ্যের মনে অঙ্কিত হয়।

প্রাণশক্তি আনন্দান্বেষণ প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির আদেশ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। প্রবৃত্তিসমূহ পরিচালিত হইয়া মানব সুখ-লাভার্থ ভাল মন্দ নানা বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু (মন্দ বিষয়ে অনুসরণ হেতু) দুঃখ, কষ্টের কশাঘাতে তাহাকে মধ্যে মধ্যে নিরস্ত হইয়া চিন্তা করিতে হয় অর্থাৎ কেন এরূপ দুঃখ ও বাধা পাইতে হইল, কি প্রকারে তাহাকে পরিহার করা যাইতে পারে, এই বিষয় চিন্তা করিতে হয়। জীবনে এরূপ প্রতিঘাত ও চিন্তা বারংবার ঘটিয়া থাকে; প্রবৃত্তি পুনঃ পুনঃ সেই দিকে যায় এবং বুদ্ধিও পুনঃ পুনঃ তাহাকে নিষেধ করে। এইরূপে প্রবৃত্তি সকল বারংবার প্রত্যাহত হইয়া ক্রমশঃ সংযত, পরিচালিত ও পরি-শুদ্ধ হয়। আনন্দও বুদ্ধিবৃত্তির এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা মানব ক্রমশঃ বিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। আনন্দ, মনোভাব বা হৃদয়াবেগ রূপে এবং বিচারশক্তি বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়।

এই প্রকারে মানব নিরন্তর অগ্রসর হইতে থাকে; ক্রমশঃ তাহার প্রত্যেক বিষয়ে মস্তিষ্ক চালনার আবশ্যক হয় না, কোনরূপ হৃদয়াবেগের প্রেরণার প্রয়োজন হয় না, বিশেষ কোন আনন্দ ও বুদ্ধির সহায়তার আবশ্যক থাকে না, কারণ তখন বুদ্ধি ও আনন্দ তাহার প্রাণগত হইয়া যায়। বুদ্ধি ও আনন্দ সচ্চিদানন্দেরই দুইটা ভাব এবং জীবাত্মা তাহাদিগকে আত্মগত করিয়া নিজ পুরুষার্থে পরিণত করে।

হৃদয়াবেগ সকল মানবকে বহির্ম্মুখী করে এবং বাহ্যবস্তুর প্রতি মমতা-যুক্ত (স্বস্বামীত্বসম্বন্ধ দ্বারা) করে। বুদ্ধি কিন্তু আমিত্বের কেন্দ্র, ব্যাক্তিত্বের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে, সকল ভূয়োদর্শনকে সে ঐ আমিত্বের কেন্দ্রের সহিত যুক্ত করে এবং সেই কেন্দ্রের সাপক্ষে সকল বিষয়ের বিচার করে। বুদ্ধিই স্বার্থপরতার প্রাচীর নির্ম্মাণ করে এবং স্বার্থপরতাই মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক করে। অবশেষে উত্তরোত্তর জ্ঞান প্রসারের দ্বারা যখন সর্ব্ব বিশ্বের জ্ঞান আমিত্বের পরিধিভুক্ত হয়—বিশ্বের পরিধি পর্য্যন্ত আমিত্বের প্রসার হয়—আমিত্বের পরিধি ও বিশ্বের পরিধি এক হইয়া যায়—বিশ্বের সর্ব্ব পদার্থে মমতাজ্ঞান হয়—বিশ্বের সহিত আমিত্বের অভেদ জ্ঞান হয়, এবং আমিত্বের কেন্দ্র বিশ্বের কেন্দ্রে বা পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ক্ষুদ্র ব্যাক্তিত্বের বা আমিত্বের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যায়, তখন সমস্ত মানবজাতি, সমস্ত বিশ্ব এক ক্ষেত্রে ও একবৃত্তে পরিণত হয় এবং মানব অহঙ্কারতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া, সেই বিশ্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞে আত্মারূপে অধিষ্ঠিত হন। মানব স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া মহত্তত্ত্বে বা মহা তত্ত্বে প্রবেশ করেন এবং বিশ্বের জ্ঞান তাঁহার করতলগত হয় অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন।

মানবের মনোভাবসকল তাহার অহঙ্কার বা আমিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয় পথে প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয় সকল বহির্জ্জগতে কার্য্য করিয়া তাহার

অভিজ্ঞতা (Experience) মানব বুদ্ধির সমীপে উপনীত করে। যে ঘটনা হৃদয়ে প্রীতিকর বা মধুর স্পন্দন উৎপন্ন করে, বুদ্ধি তাহাকে আনন্দ জনক এবং যদ্দারা তদ্বিপরীত স্পন্দন হয় তাহাকে দুঃখজনক বলিয়া ধারণা করিয়া রাখে। এই সকল ঘটনার তালিকা মানবের স্মৃতিক্ষেত্রে অঙ্কিত থাকে এবং যথাসময়ে বুদ্ধি, তাহারা আনন্দজনক বা দুঃখজনক তাহা পৃথক করিয়া নির্ব্বাচন করে। এইরূপে হৃদয়াবেগসকল নিয়ন্ত্রিত ও শিক্ষিত হয়। এইরূপে বুদ্ধি ও বিবেকবশে হৃদয়াবেগ সকল স্বভাবতঃ বাহ্য জগতে রাগ, দ্বেষ রূপে (সুখকর বিষয়ে অনুরাগ ও দুঃখজনক বিষয়ে দ্বেষ) প্রকটিত হয়।

এই প্রকারে ইন্দ্রিয় সকল মনের সহিত, হৃদয়াবেগ সকল বুদ্ধিবৃত্তির সহিত এবং ইন্দ্রিয় সকল মহত্তত্ত্বের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ হয় এবং মানব তখন কাম-মানসিক ভাবে উপনীত হয়। ইহা ক্রমাভিব্যক্তির বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী।

মানুষ প্রথমাবস্থায় যাহা কিছু মধুর তাহাতেই আসক্ত হয় এবং যাহা কিছু বিস্বাদ তাহাতে বিরক্ত হয়। কিন্তু ভূয়োদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে পারে যে, অত্যধিক মিষ্টতাও তিক্তের ন্যায় অরুচিকর ও দুঃখজনক। তাই যথাসময়ে মিতাচারিতা জ্ঞানী ব্যক্তির কামনায় স্বভাবগত হইয়া যায়।

প্রথমে যাহা মিষ্ট অনেক স্থলে শেষে তাহাই কটু হইয়া পড়ে; আর যাহা আপাততঃ মধুর বোধ হয়, তাহাই শেষে তিক্ত বলিয়া প্রতীত হয়।

"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিনামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং আত্মবুদ্ধি প্রসাদজং॥
বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসংস্মৃতং ॥

(গীতা ১৮ অঃ ৩৭-৩৮

অগ্রে বিষবৎ শেষে অমৃত সমান।
সে সুখ সাত্বিক বলি জানে মতিমান॥
আত্মবুদ্ধি প্রসাদ তাহাতে লব্ধ হয়।
পরম আনন্দকর নাহিক সংশয়॥
বিষয়ে ইন্দ্রিয়যোগে আগে যেই সুখ।
অমৃতের মত, কিন্তু শেষে ঘটে দুঃখ॥
তাহাই রাজস্ সুখ জানিহ নিশ্চয়।
বুদ্ধিমান সেই সুখে মত্ত নাহি নয়॥

পুনঃ পুনঃ সুখদুঃখানুভূতির ফলে মানব বিজ্ঞতা লাভ করে ও পরিণামদর্শী হয় এবং পরিশেষে বিমৃষ্যকারীতা তাহার স্বভাবসিদ্ধ হয়।

প্রথম আবেগে হঠাৎ কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময়ে কুফল উৎপন্ন হয়। ক্রোধাদি রিপুপরতন্ত্র হইলে অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং বারংবার হৃদয়াবেগ সংবরণ দ্বারা সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা ও উপরতি মনুষ্যের স্বভাবগত হয়।

বুদ্ধি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হৃদয়াবেগসমূহ সদ্‌গুণে পরিণত হয়। হৃদয়াবেগ সকলের ঔৎকর্ষ সাধন ও সংযমন, মানবের চরিত্র গঠনের ও নৈতিক উন্নতির মুল এবং তাঁহার সকল শিক্ষার চরম। রাগ ও দ্বেষকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপথগামী করাই মানুষের ক্রমবিকাশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। যিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হন, তাঁহার মার্জ্জিত হৃদয়াবেগ সকল তাঁহাকে কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর করে; তিনি দেশহিতৈষী হন, তিনি জগৎহিতৈষী হন, তিনি সর্ব্বজীবের বন্ধু হন এবং সর্ব্বভূতে দয়া করেন। তখন প্রেমই তাঁহার হৃদয়ের প্রধান আবেগ এবং সেই প্রেম ক্রমশঃ সর্ব্বজগতে প্রসারিত

হয়। এইরূপে যখন তাঁহার আমিত্বের প্রাচীর বিলুপ্ত হয় * এবং তাঁহার অহঙ্কারিক বা নিম্নমানস পরিমার্জ্জিত হইয়া বিশ্বের মনস্তত্ত্বে বা উচ্চ মানসে পরিণত হয়, তখন তাঁহার হৃদয়াবেগ সকল ইন্দ্রিয়বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক বুদ্ধিতত্ত্বে উপনীত হইয়া অন্তরস্থ পরমাত্মার জ্যোতিঃ জগতে প্রকাশ করে। প্রকৃতই তখন আত্মা, বুদ্ধি ও মানস এক হইয়া যায় এবং মানব তখন সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের সাকার প্রতিচ্ছবি হন। ইহাই মানবের জীবন্মুক্ত অবস্থা।

এখন আমরা বুঝিতে পারিব, কেন নীতিবিজ্ঞান বিশেষভাবে হৃদয়াবেগ সকলের ঔৎকর্ষ্য বিধানে তৎপর এবং কেনই বা এই বিজ্ঞান ঈশ্বরের আনন্দ ভাবের সহিত সম্বন্ধ।

সদাচার হইতে যে আনন্দ আর কদাচার হইতে যে নিরানন্দের উৎপত্তি হয়, তাহা নানা উপায়েই প্রদর্শিত হইতে পারে; কিন্তু সে সকলই এক যুক্তির প্রকার ভেদ মাত্র। সেই যুক্তিটী পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, একই আত্মা সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছেন, সুতরাং অপরের অনিষ্টাচরণ করিলে অবশেষে নিজেরই অনিষ্ট সাধন হয়।

শ্রুতি বলিতেছেন :—

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"

(বৃহদারণ্যক ৫।৯।২৮)

"ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ"।

পুনঃ পুনঃ এই "ব্রহ্মানন্দের" কথা উক্ত হইয়াছে এবং আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হইয়াছে। ঈশ্বর অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মার ত্রিবিধ ভাবকে

---

* "মনোহি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চাশুদ্ধমেব চ।
অশুদ্ধং কাম সঙ্কল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতং॥
মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্ব্বিষয়ং স্মৃতং॥"

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ

সচ্চিদানন্দ ভাব বলা হইয়াছে। জীবাত্মা ব্রহ্মেরই অংশ এবং তদ্ভাবান্বিত ; সুতরাং আনন্দ জীবাত্মারও স্বরূপ। মুণ্ডকোপনিষদে সগুণ ব্রহ্মকে "বিরাজ" অর্থাৎ নিষ্কল ও "শুভ্র" অর্থাৎ পবিত্র বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সুতরাং কেবল পবিত্র ও সৎ বস্তু সকলই তদ্ভাবাপন্ন এবং তাঁহার আনন্দময় ভাবের অনুরূপ। তাই পবিত্রতাই জীবাত্মার স্বরূপ। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে :—

"তং বিদাচ্ছুক্রমমৃতং"

"জীবাত্মাকে পবিত্র ও অমর বলিয়া জানিও"

অতএব পবিত্রতা ও আনন্দ জীবাত্মার স্বভাবসিদ্ধ ও তাহা হইতে অভেদ, কারণ একত্বই পবিত্রতা এবং একত্বের অনুভূতিই আনন্দের অনুভূতি।

প্রত্যেক জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ ও তদ্ভাবান্বিত বলিয়া স্বতন্ত্র-দেহস্থ থাকিয়াও অপরাপর দেহস্থ পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে সতত সচেষ্ট। এই মিলনের পরমানন্দের জন্য জীবাত্মার মিলনেচ্ছা একান্ত স্বাভাবিক এবং মিলন সংঘটিত হইলে অব্যয় সুখোৎপত্তি হয়। এ বিষয়ে পরস্পর বিভিন্ন হইলেও, সুখাকাঙ্খা সম্বন্ধে তাহারা সকলে সমভাবাপন্ন। অবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আনন্দের জন্য লালায়িত। তাহারা নানা উপায়ে সুখান্বেষণ করে বটে, কিন্তু সকলেই সুখের অন্বেষণ করে। দেহাবরণে অন্ধ হইয়া জীবাত্মা প্রায়ই মন্দটী বাছিয়া লয় বটে, কিন্তু তাহার নির্ব্বাচণের উদ্দেশ্য সর্ব্বদাই এক সুখাভিলাষ। জীবাত্মা জন্ম জন্মান্তরে কেবল এক সুখান্বেষণে ব্যস্ত। ইহাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ; ইহাই তাহার চির লক্ষ্য। সে যে কষ্টকর কার্য্য করে, তাহা কেবল অধিকতর আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে। সে যে দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করে,

সে কেবল তাহাদের ফলে সুখ ও আনন্দ পাইবে বলিয়া করে। আনন্দই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ; অপর সকলই সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়মাত্র। মানব পরমানন্দের অধিকারী হইবার জন্যই চিরজীবন সর্ব্বত্যাগী হইয়া কঠোর তপস্যাচরণ করে। এক কথায় জীবের ক্রমাভিব্যক্তি আনন্দের অন্বেষণ মাত্র। বারংবার নিষ্ফল হইয়াও অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে মানব এই অন্বেষণে নিযুক্ত থাকে এবং শেষে বুঝিতে পারে যে পবিত্রতা, প্রজ্ঞা ও আনন্দ তিনিই এক ও অবিভাজ্য। তখন তাহার শান্তিলাভ হয় কারণ পবিত্রতা, প্রজ্ঞা ও আনন্দ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দই ঈশ্বরের স্বরূপ।

অতএব দেখা গেল যে নীতিবিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্র আমাদিগকে সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মমার্গে লইয়া যায় ও সর্ব্বোচ্চ সত্যের উপলব্ধি করাইয়া দেয় এবং যখন নীতিশাস্ত্র চরম উদ্দেশ্যে উপনীত হয়, তখন নীতি আর ধর্ম্মের কোন পার্থক্য থাকে না--তখন নীতিই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মই নীতি উভয়েরই চরম লক্ষ্য ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক জীবন। তাই হিন্দু নীতিবিজ্ঞান হিন্দুধর্ম্মের একটী অঙ্গ মাত্র এবং তাহাদিগকে পৃথক করিতে পারা যায় না।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্যক্তিগত গুণ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সর্ব্বভূতের মধ্যে পরস্পরানুকূল অর্থাৎ সহানুভূতি ও প্রীতির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করাই নীতিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই সম্বন্ধ দ্বিবিধঃ—প্রথমতঃ সর্ব্বভূতের পরস্পর অশেষ প্রকার সম্বন্ধ; দ্বিতীয়তঃ জীবাত্মার সহিত নিজ উপাধিগণের সম্বন্ধ। শাস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন যে মানবদেহ নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট ও সপ্তকোষময়।* আপাততঃ আমাদের নিম্নকোষ চতুষ্টয়ের অর্থাৎ (১) অন্নময়কোষ বা স্থূলদেহ যাহাতে প্রাণবায়ুর ক্রিয়া হয়; (২) কামময়কোষ যাহাতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) মূলশক্তি নিহিত থাকে; (৩) মনোময় কোষ (৪) বুদ্ধিময় বা আনন্দময় কোষ এই চারিটীর কথা মনে রাখিলেই হইবে। বর্ত্তমান যুগের নীতিবিজ্ঞান কেবল অন্নময়, কামময় ও মনোময় কোষের সহিত সংশ্লিষ্ট। কারণ বুদ্ধি বা আনন্দময় কোষে উপনীত হইলে, মানুষ আর মানুষ থাকে না, ঐশ্বরিক ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তখন লৌকিক নীতি-বিজ্ঞানের সীমার অতীত হয়।

এই কারণে মনুষ্যের নিম্নকোষত্রয় ও তদ্‌গ্রাহ্য বিষয় সমূহই নীতি-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে জীবাত্মা সকল পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত যথাঃ—দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, নরগণ ও ভূত-সামান্য অর্থাৎ মানবের নিম্নস্থ সর্ব্বপ্রকার জীব।

---

* এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথমাংশের শেষ পৃষ্ঠার তালিকা দেখ।

অতএব মানবের প্রথম কর্ত্তব্য নিজ দেহের কোষসমূহ সম্বন্ধে; এবং তৎপরে উক্ত পঞ্চবিধ জীবাত্মা সম্বন্ধে।

মানবদেহকে জীবাত্মার সহিত সম্পূর্ণ একসুরে (harmonious) আনিতে পারিলে অর্থাৎ তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে জীবাত্মার অনুগামী ও উপযোগী করিতে পারিলে, তবে ইহা পরমাত্মার জীবনের বিকাশ সাধনক্ষম উপাধিতে পরিণত হইবে।

সমগ্র বিশ্বকে জীবাত্মার সহিত একসুরে আনিতে পারিলে (অর্থাৎ সর্ব্বভূতে * সমদর্শী হইলে—সর্ব্বভূতে এক পরমাত্মাকে সমভাবে বিরাজিত দেখিতে পারিলে), ঐশ্বরিক জীবন মানবহৃদয়স্থ আত্মার কেন্দ্রের মধ্য দিয়া সমস্ত বিশ্বে প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন মানব ঐশ্বরিক বিধির অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছার সহিত একাত্ম হইয়া থাকেন—তখন তিনি ভগবৎবাণী বা প্রণবের বিকাশ স্বরূপ হন। ইহাই মানবের চরম লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে সকলকে তৎপর হওয়া উচিত। নীতিশাস্ত্র আমাদিগকে সেই লক্ষ্য পথে লইয়া যায়।

এইবারে মনুষ্যের উপাধি সমূহের ঔৎকর্ষ্য বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

প্রথম স্থূল শরীর—দেহকে পরিষ্কার ও সুস্থ রাখা আবশ্যক। শুদ্ধাচার ও সুস্থদেহ মানবজীবনের মাধুর্য্য ও পারিপাট্যের সহিত সম্বদ্ধ; দেহ সুস্থ ও পবিত্র থাকিলে, সকল কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং মানব প্রফুল্ল ও সুন্দর থাকে। পীড়িত ব্যক্তির মন অসুস্থ, সুতরাং সকল কার্য্যে মনোযোগ দিতে পারে না। অধিকন্তু দেহের একটী কোষ অসুস্থ হইলে অপর কোষ সমূহকেও অসুস্থ করে।

* "সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ"॥

সাত্বিক আহার দ্বারা দেহ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কারণ খাদ্যদ্রব্য রক্তে পরিণত হইলেও, তাহার সূক্ষ্ম চৌম্বক্যাদি গুণ সমূহ (Magnetic properties) তাহাতে থাকে এবং ইন্দ্রিয় ও মনে তদনুরূপ শক্তি উৎপাদন করে। গীতা বলিতেছেন:—

আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ॥
কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময় প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামস প্রিয়ং॥

(গীতা ১৭ অঃ)

আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখ প্রীতিকর।
স্নিগ্ধ রসযুক্ত হৃদ্য সাত্ত্বিক আহার॥
অতিকটু অতিঅম্ল অত্যন্ত লবণ।
অতি উষ্ণ অতি তীক্ষ্ণ (মরিচ যেমন)॥
অতিরুক্ষ বিদাহক দ্রব্য সব আর।
দুঃখ শোকব্যাধিমূল রাজস আহার॥
অতীত প্রহরকাল (হয়েছে শীতল)।
রসহীন পর্য্যুসিত দ্রব্য হীন বল॥
দুর্গন্ধ উচ্ছিষ্ট আর অমেধ্য ভোজন।
প্রিয় জ্ঞান করে সদা তামসিক জন॥

সত্বাধিক্য দ্বারা জীব উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সত্ত্বগুণ হইতেই সদ্ভাবের উদ্রেক হয়।

দ্বিতীয়তঃ সূক্ষ্ম শরীর—ইন্দ্রিয় সকল বহুজন্মের সংস্কারবশে রাজসিক পাশব প্রবৃত্তি নিচয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয়দমন

একান্ত প্রয়োজনীয়। দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার অবশ্যই করিতে হইবে কিন্তু ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সমূহে রাগ, দ্বেষ পরিহার করা আবশ্যক। আমাদের সকলকেই অবশ্য ইন্দ্রিয় ক্রিয়া করিতে হইবে কিন্তু তাহা বলিয়া নিজ নিজ রাগ দ্বেষ (likes and dislikes) দ্বারা সেই ক্রিয়া সকলকে বিকৃত করা উচিত নহে। এই রাগদ্বেষজনিত ইন্দ্রিয়বিকারই বাহ্যজগতের সহিত আমাদের বৈষম্যের মূল। প্রত্যেক মনুষ্য নিজ রাগ, দ্বেষ দ্বারা একটী করিয়া (মনোময়) নিজ জগত নির্ম্মাণ করে। এই স্বরুচিসৃষ্ট (মনোময়) জগৎগুলি পরস্পর পৃথক এবং সকলেই ঈশ্বরের প্রকৃত জগৎ হইতে ভিন্ন। নিজ নিজ রাগদ্বেষবশে—আমিত্বের মোহময় রঞ্জনে—এবং রজোগুণের বিক্ষেপশক্তিবশে অন্ধ হইয়া মানুষ জগতের বিধি অর্থাৎ ভগবৎবাণী বুঝিতে পারে না।

এইজন্য মনকে ইন্দ্রিয়গণের অধীন হইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রত্যুত বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান দ্বারা মনকে পরিচালিত করা কর্ত্তব্য এবং ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করা একান্ত বিধেয়।

ইন্দ্রিয় সমুদয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল স্থূল শরীরে অধিষ্ঠিত। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি স্থূল শরীরস্থ হইলেও আসল ইন্দ্রিয় সমূহ মানবের সূক্ষ্ম দেহে অবস্থিত। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণে কিছু দোষ নাই; তজ্জনিত রাগ ও দ্বেষই দোষ, রাগ ও দ্বেষই মানবকে অসহায়বৎ পরিচালিত করে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে তাহারা স্ব স্ব বৃত্তি চরিতার্থতার জন্য নিয়োজিত করে।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থেরাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌহ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥

(গীতা ৩ অঃ ৩৪)

ইন্দ্রিয় বিষয়ে আছে ইন্দ্রিয়ের
দ্বেষ কিম্বা অনুরাগ।
তাদের অধীন হবে না কখন
দুই (ই) মোক্ষ প্রতিকূল।

ইন্দ্রিয় বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ, আসক্তি ও বিরক্তি লইয়াই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার বাসনার উৎপত্তি। হৃদয়াবেগ হইতেই বাসনার উৎপত্তি। বাসনা বা হৃদয়াবেগকে সংযত ও পবিত্র করা মানবের একান্ত কর্ত্তব্য। আসক্তি বা রাগকে সার্ব্বজনীন অনুরাগে পরিণত করিতে হইবে। ব্যক্তিগত বিষয়ে অর্থাৎ কোন জীব বা জীবসমষ্টি সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বেষ বা বিরক্তি রাখিবে না; প্রাকৃতিক বিধি বা ঈশ্বরেচ্ছাবিরোধি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কেবল মানসিক দ্বেষ রাখিবে। অর্থাৎ পাপীকে ঘৃণা বা দ্বেষ করিবে না (বরং অজ্ঞতানিবন্ধন সত্য পথ ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহাকে অনুকম্পা করিবে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেমন কনিষ্ঠ ভ্রাতার অজ্ঞতার দরুণ বিরক্ত না হইয়া আরও অধিক ভালবাসার সহিত তাহাকে শিক্ষা দেন, সেইরূপ অধিকতর যত্নের সহিত তাহার অজ্ঞান বা মোহ নিরাকরণে চেষ্টা করিবে) কিন্তু পাপকে দ্বেষ করিবে অর্থাৎ পাপ প্রবৃত্তিকে মনে আসিতে দিবে না। এরূপ করিলে আর পাপ প্রবৃত্তির দ্বেষ নিবন্ধন তোমার সার্ব্বজনীন প্রেমের ক্রটী হইবে না। তাহা হইলে পাপ প্রবৃত্তি বর্জ্জন জন্য তোমার মনে পবিত্রতা বদ্ধমূল হইবে; অথচ পাপীর প্রতি প্রেমের ক্রটী হইবে না।

মন ইন্দ্রিয় সংযোগে রাজসিক ভাব প্রাপ্ত হয় এবং বুদ্ধির সংযোগে সাত্ত্বিক ভাব লাভ করে। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকলেরই মন রাজস-ভাবাপন্ন। অতএব সকলেরই মনকে সত্ত্বভাবাপন্ন করিতে যত্নবান হওয়া উচিত। রাগ ও দ্বেষ এই দুইটী মনের আবর্জ্জনা; এই দুইটীকে বিতাড়িত করিতে পারিলে মন পবিত্র ও স্বচ্ছ হয়।

মনের আর একটী দোষ বিক্ষেপ ; ইহা এককালে নানা বিষয়ে ধাবিত হইতে চাহে এবং ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় বিষয়বিশেষে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা দুরূহ হয়। শাস্ত্রে উপমাস্থলে কথিত আছে যে, দশেন্দ্রিয়রূপ দশটী দুর্ব্বার অশ্ব মনোরূপ রথকে এককালে দশটী বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ করিতেছে ; কাজেই রথ স্থির লক্ষ্য হইয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট দিকে যাইতে পারে না। এই বিক্ষেপ দূর করা চাই ; কেন না মনের : একাগ্রতা সাধন ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না।

মনের রাগ দ্বেষরূপ আবর্জ্জনা ও বিক্ষেপপ্রবণতা বিদূরিত হইলে মন সত্বপ্রধান হয়। তখন আত্মা তাহাতে অর্থাৎ মনে প্রতিভাত হন এবং সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি দ্বারা আনন্দের উদয় হয়। তখনই ঐশ্বরিক বিধির (Divine) সহিত একপ্রাণতা আসে এবং সার্ব্বজনীন প্রেমের আবির্ভাব হয়।

চিত্তবিক্ষেপ নিরোধ করিবার প্রথম উপায়, মনকে বাহ্য বিষয়ের চিন্তা হইতে বিরত করিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিযুক্ত করা। নানা সত্যের আলোচনা দ্বারা আমাদিগকে মূল সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে আমরা সেই অনন্ত অদ্বয় সত্যে অর্থাৎ সত্যময় ঈশ্বরে উপনীত হইতে পারিব এবং সৎস্বরূপ ঈশ্বরকে দৃঢ় ধারণা করিতে পারিব। তখন আমরা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে এক ঈশ্বরের বিকাশ ও তদ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া বুঝিতে পারিব ; সকল কার্য্যই তাঁহার কার্য্য ও সকল বিধিই তাঁহার বিধি বলিয়া উপলব্ধি করিব। তখন বহুত্ব জ্ঞান দূর হইবে এবং ভেদ জ্ঞানের তিরোভাবের সহিত সর্ব্বত্র সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মনের শিক্ষা—মনকে বশীভূত করাই মনুষ্যের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। তৎপরে বাক্যের ও কার্য্যের অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের সংযম করিতে হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্থূল দেহ ও তাহার কোষনিচয়কে উপেক্ষা করিলে চলিবে না ; প্রত্যুত তাহাদিগকেও পরস্পর অনুকূল ও মনের আজ্ঞাকারী করিতে হইবে।

যে সকল গুণের উন্মেষ আবশ্যক, তন্মধ্যে কতিপয় মনুক্ত দশাঙ্গ ধর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট আছে :—

"ধৃতিঃক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং" ॥

(মনু ৬।৯২)

ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, আর ইন্দ্রিয় শাসন।
শুদ্ধাচার নির্লোভিতা, মনের সংযম ॥
বুদ্ধি, বিদ্যা, ক্রোধত্যাগ, আর সত্যাপণ।
এই দশ হয় ভবে ধর্ম্মের লক্ষণ ॥

অন্যত্র সংক্ষেপে মনু তাহাই বলিতেছেন:—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বণ্যে ব্রবীন্মনুঃ"।

(মনু ১০।৬৩)

অহিংসা, অস্তেয়, সত্ত্ব, ইন্দ্রিয় সংযম।
আর পবিত্রতা, সর্ব্ব বর্ণের ধরম ॥

শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় এই সাত্বিক ধর্ম্ম লক্ষণ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা:—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিজ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায় স্তপ আর্জ্জবং ॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলং ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবী মভিজাতস্য ভারত ।।

(গীতা ১৬ শ অঃ)

(ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ চতুর্থ অধ্যায়ে দেখ)

যদিও ইহার মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্ববিবৃত তিন শ্রেণীর গুণের কোনও না কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাহা হইলেও ইহারা প্রায় সকলেই জীবাত্মার প্রেমাবেগের বিকাশ আত্মগত গুণ—তাঁহার প্রেমভাব বিকাশের, স্বভাবের সাম্যতা বিধানের ও প্রবৃত্তি সংযমনের উপায়।

সত্যনিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যথেষ্টই আলোচনা করা হইয়াছে। সত্যবাদিতা, সততা, ঋজুতা ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি ইহারই ভাবান্তর মাত্র। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" "সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ" "এহু জগু সচাকি কোঠরি" ইত্যাদি সূত্রবচনে সত্যনিষ্ঠার নিরতিশয় প্রাধান্য সর্ব্বকালে প্রতিষ্ঠিত আছে।

সর্ব্বপ্রকার মানসিক প্রবৃত্তির, সকল বাসনার ও দৈহিক ক্রিয়ার সংযমন অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে আত্মার ইচ্ছাধীন করার নাম "দম" বা আত্মসংযম। সংযমী মানব জানেন যে, তিনি আত্মা এবং বিভু; এবং স্থূল, সুক্ষ্ম উপাধিসকল তৎপরিচালিত যন্ত্র মাত্র—তাঁহার আজ্ঞাকারী বাহন মাত্র। অশ্বারোহীর যেমন অশ্বের উপর আত্মাভিমান হয় না—অশ্বই তিনি, তিনিই অশ্ব অর্থাৎ অশ্বে ও তাঁহাতে অভেদ এরূপ মনে করেন না—সেইরূপ সংযমীর কখনও দেহাত্মাভিমান হয় না—দেহই তিনি, তিনিই দেহ অর্থাৎ দেহে ও তাঁহায় অভেদ এরূপ মনে করেন না। প্রত্যুত তিনি জানেন যে, দেহ তাঁহার

বাহন, আর তিনি দেহের আরোহী ও প্রভু। অশ্বারোহী যেমন অশ্বকে আপন ইচ্ছায় পরিচালিত করেন, আত্মাও তদ্রূপ দেহকে যথেচ্ছা পরিচালিত করিবেন। আরোহী যেমন অশ্বের প্রভু ও চালক, আত্মা তদ্রূপ দেহের প্রভু ও চালক। অশ্বকে সুনিয়ন্ত্রিত না করিতে পারিলে যেরূপ আরোহীর বিপদ অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ দেহকে স্ববশে রাখিতে না পারিলে মানবের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য পণ্ডিতেরা সদশ্বের আরোহী ও দুষ্টাশ্বের আরোহীর সহিত সংযমী ও অসংযমীর তুলনা পুনঃ পুনঃ করিয়াছেন। সুপটু অশ্বারোহী যেরূপ সুশিক্ষিত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক নিজ ইচ্ছামত গমন করিতে পারেন অর্থাৎ কখনও ধীরে, কখনও দ্রুতভাবে নিজ গন্তব্য স্থানে স্বেচ্ছাক্রমে যাইতে পারেন, সংযমীও সেইরূপ দেহমনেন্দ্রিয় স্বেচ্ছায় পরিচালিত করিয়া পুরুষার্থ সাধনে সমর্থ হন।

আত্মসংযমই নৈতিক উন্নতির মূলোপায় বলিয়া শাস্ত্রকারেরা পুনঃ পুনঃ এই বিষয়ের উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান মনু ইহার অত্যাবশ্যকীয়তার কথা বলিয়া পরে উপদেশ দিতেছেন যে কর্ম্মের তিনটী উৎপত্তি কারণ আছে এবং তাহার প্রত্যেকটীকে স্ববশে আনা আবশ্যক।

"কর্ম্ম মনোবাঙ্গোহ সম্ভবং"

এই মন, বাক্ ও দেহের সংযম সাধনই সিদ্ধির একমাত্র উপায় যথাঃ—

বাগ্দণ্ডোহয় মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি উচ্যতে ॥
ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কাম ক্রোধৌ সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিগচ্ছতি ॥"

(মনু ১০।১৩

বাক্‌দণ্ড, মনোদণ্ড, কায়দণ্ড আর।
বুদ্ধিতে নিহিত যাঁর সম্যক প্রকার।
তিনিই ত্রিদণ্ডী ইহা শাস্ত্রের লিখন।
নহে হস্তে দণ্ডধরা শুধু বিড়ম্বন ॥
সর্ব্বভূত মধ্যে থাকি (এই) ত্রিদণ্ড শাসন।
করেন গ্রহণ, (আর) কাম ক্রোধের দমন ॥
তাহারই ত্রিদণ্ডফলে সিদ্ধি লাভ হয়।
শাস্ত্রের বচন কভু অন্যথা না হয় ॥

এই ত্রিবিধ সংযম মধ্যে মনঃ সংযমই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও সর্ব্বপ্রধান, ারণ বাক্য ও দৈহিক কার্য্য মানস পরতন্ত্র। মনু আরও বলিতেছেন :—

"মনো বিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকং"

(মনু, ৪)

মনকেই সর্ব্ববিষয়ে প্রবর্ত্তক বলিয়া জানিবে। মনকে বশে আনিতে ারিলে আর সকলই বশীভূত হয়। কিন্তু মন অত্যন্ত চঞ্চল; তাহাকে আয়ত্ত করা নিতান্ত দুরূহ। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই সমস্যা জানাইয়াছিলেন :—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং ॥

(গীতা ৬।৩৪)

প্রমাথী, চঞ্চল, অতি বলবান, মন।
দেহেন্দ্রিয়-ক্ষোভ-কর না মানে বারণ ॥
বায়ুসম দেখি তার নিগ্রহ দুষ্কর।
কেমনে দমন তার করে বল নর ॥

ভগবান এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন উহার আর দ্বিতীয় উত্তর নাই :—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥

(গীতা ৬।৩৫)

সুনিশ্চয় মহাবাহু মন দুর্নিবার।
চঞ্চল হলেও আছে উপায় তাহার ॥
কেবল অভ্যাস যোগ করহ আশ্রয়।
বৈরাগ্য সহায়ে বশ হইবে নিশ্চয় ॥

অধ্যবসায় সহকারে সংযম অভ্যাস করিতে করিতে এই দুর্দ্দম মন ও সম্পূর্ণ সংযত হয়। ইহা ভগবদ্বাক্য; সুতরাং হতাশ হইবার কারণ নাই। মন সংযত না হইলে মানব কখনও সুখী হইতে পারে না। ভগবান আরও বলিয়াছেন :—

"যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥
অস্থির চঞ্চল মন যথা যথা যাবে।
তথা হতে আনি পুনঃ আত্মায় বসাবে ॥

এইরূপে যত্ন করিলে নিশ্চয়ই মন সংযত হইয়া সুখোৎপাদন করিবে। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুখকে মানস তপস্যার অঙ্গ বলিয়াছেন :—

"মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্ম বিনিগ্রহঃ।
ভাব সংশুদ্ধি রিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে"।

(গীতা ১৭।১৬)

সৌম্যভাব, বাক্যত্যাগ, ইন্দ্রিয় দমন।
চিত্তের প্রসাদ, মনোভাববিশোধন।
এই পঞ্চ সাধনায় রত যেই হয়।
মানসিক তপস্যার তাহে পরিচয়॥

কিন্তু বাসনা সকল মানবকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিচলিত ও বিব্রত হয়। কামনা চিরবর্দ্ধমান, চির অতৃপ্ত। বস্তুতঃ উপভোগে কামনার আগুণ গুণ জ্বলিয়া উঠে।

"ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভুয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

(মনু ২।৯৪)

কাম্যবস্তু উপভোগে কাম শান্ত নয়।
অগ্নি যথা ঘৃত পেলে আরও বৃদ্ধি হয় ॥

ইন্দ্রিয় সংযম সাধনে মনের সহায়তা প্রয়োজন; নচেৎ সংযম চেষ্টায় কেবল চাঞ্চল্য ও অশান্তির উদয় হইবে। কিরূপে মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয় সংযত হয়, তাহা মানবকে শিক্ষা করিতে হইবে, কারণ মনশ্চাঞ্চল্যের প্রলোভন সকল ইন্দ্রিয় পথেই আসিয়া মনকে আক্রমণ করে।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কেই বিশেষ ভাবে সংযত করা আবশ্যক। যেহেতু একটী ইন্দ্রিয়ও যদি অসংযত থাকে, তাহা হইলেই মনকে উচ্ছৃঙ্খল করিবেঃ—

"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥"

(গীতা ২।৬৭)

বিষয় নিরত ইন্দ্রিয় সবার
একটীও হলে মনের অবশ;
একাই নিশ্চয় ডুবাইয়া দেয়
মানবের জ্ঞান, (ইথে নাই আন)
বায়ু যথা জলে তরণী ডুবায়,
(নাবিক প্রমত্ত হলে)

একটী মাত্রও ইন্দ্রিয় অবশ হইলে মানবের যে কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা ভগবান মনু সুন্দর উপমা দ্বারা বুঝাইয়াছেনঃ—

"ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
ততোঽস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞাদৃতেঃ পাদাদিবোদকং॥"

(মনু ২।৯৯)

ইন্দ্রিয়গণের একটীও যদি
মনের অবশ হয়।
ভিস্তি ছিদ্র দিয়া জলের মতন
ক্রমে জ্ঞান হরে লয়॥

ইন্দ্রিয়সকল মনের ছিদ্রস্বরূপ। ভিস্তির একটী মাত্র ছিদ্র দিয়া ক্রমশঃ যেমন সমুদয় জল বাহির হইয়া যায়, তদ্রূপ একমাত্র অসংযত ইন্দ্রিয় ছিদ্রে মানবের সমস্ত প্রজ্ঞা ক্ষরণ হইয়া থাকে।

অতএব অগ্রে মনকে সংযত করিয়া তদ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিতে হইবে। তজ্জন্য কঠোপনিষদে মনকে অশ্বরশ্মি (লাগাম) বলা হইয়াছে, কারণ এই রশ্মির সাহায্যে (দেহরথের) বুদ্ধিরূপ সারথী ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে পরিচালিত করে :—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু বিষয়াস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥

*   *   *   *

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণো পরমং পদং"॥

(কঠোপ৩।৩—৯)

আত্মাকে জানিবে রথী রথ সে শরীর।
বুদ্ধিই সারথী তাহে রশ্মি মন স্থির ॥
অশ্ব সে ইন্দ্রিয়চয় বিষয়ে ভ্রমণ।
মনেন্দ্রিয় যুক্ত জীব ভুঞ্জে অনুক্ষণ॥
অবোধ যে জন যার অসংযত মন।
বশেতে রাখিতে নারে সে ইন্দ্রিয়গণ॥
সারথির হাতে যথা দুষ্ট অশ্বগণ।
চঞ্চল ইন্দ্রিয় সব ফিরে অনুক্ষণ॥
বুদ্ধিমান লোক সদা সুসংযত মনে।
ইন্দ্রিয় সকলে বশ করে সযতনে॥
সদশ্ব সারথী হাতে সদা ইচ্ছামত।
ইঙ্গিতে চালিত হয়ে ফিরে অবিরত॥

*   *   *   *

বিজ্ঞান সারথী যার মন বল্গা হয়।
বিষ্ণুর পরম পদ লভে সে নিশ্চয়॥

ভগবান মনুও এই উপমার ব্যবহার করিয়াছেন ঃ—

"ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্যান যন্তেব বাজিনাং॥"

(মনু ২।৮৮)

ইন্দ্রিয় নিচয়   করে বিচরণ
মনোহারি সব   বিষয় মাঝারে।
যন্তা যথা করে   বাজিরে দমন
জ্ঞানীজনে তথা   দমে তা সবারে॥

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বর্ণনা করিয়া, পরে মনু বলিতেছেন, যে উহাদের দমন মনঃসংযমের অন্তর্গত:—

"একাদশং মনো জ্ঞেয়ংস্বগুণে নোভয়াত্মকং।
যস্মিঞ্জিতে জিতাবেতৌভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ॥"

(মনু ২।৯২)

ইন্দ্রিয়গণের একাদশ মন
উভয় প্রকৃতি স্বগুণে তাহার।
যাহাকে জিতিলে এ দুই পঞ্চক
সহজেই জিত বিদিত সবার॥

বাক্য গুরুজনের সম্ভ্রমজনক, তুল্যব্যক্তিগণের আদরসূচক ও নিকৃষ্ট জনগণের প্রতি বিনীত হইলে, বাক্-সংযম বা 'বাক্‌দণ্ড' সাধিত হইয়া থাকে। এ বিষয় পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে; এখানে কেবল সাধারণ ভাবে সাধুবাক্যের বর্ণনা করা যাইতেছেঃ—

"অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥"

(গীতা ১৭।১৫)

অনুদ্বেগকর বাক্য সত্য হিতকর।
বেদাভ্যাস বাঙ্ময় তপস্যা মনোহর॥

ভগবান মনু এ সম্বন্ধে বলিতেছেনঃ—

"বাচ্যর্থা নিয়তাঃ সর্ব্বে বাঙ্মূলা বাগ্বিনিঃসৃতাঃ।
তাং তু যঃ স্তেনয়েদ্বাচং স সর্ব্বস্তেয় কৃন্নরঃ॥"

(মনু ৪।২৫৬)

বাক্যার্থের বলে সবই আছে নিয়ন্ত্রিত।
বাক্যই সবার মূল, বাক্যেই উদিত॥
বাক্যে যেই ছল, চুরি, অনৃত আচরে।
সকল বিষয়ে চোর জানিও তাহারে॥

সনাতন ধর্ম্ম বাক্‌শাসনকে এইরূপ প্রাধান্য দিয়াছেন। 'কায়াদণ্ড' সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিতেছেনঃ—

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরংতপ উচ্যতে॥"

(গীতা ১৭।১৪)

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, সুধীর পূজন।
শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্যের ধারণ ॥
অহিংসা সকলে, এই পঞ্চ অঙ্গময়।
শারীরিক তপঃ কহি শুন ধনঞ্জয় ॥

এইরূপ কায়-সংযম হইতে চিত্তের সাম্য সমতা (Balance), ধৈর্য্য, শান্তি ও সন্তুষ্টি উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য আত্মসংযমের মূলমন্ত্র। তন্মধ্যে বৈরাগ্যই বিশিষ্ট এবং সমস্ত কথাটীর অর্থ কঠোপনিষদ হইতে উদ্ধৃত শ্লোককয়েকটীর সাহায্যে আলোচনা করা আবশ্যক। কট শুদ্ধসত্ব বুদ্ধিকে (Pure reason) সারথীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। বুদ্ধিই একহস্তে মনোরূপ বহুশাখাযুক্ত প্রগ্রহ ধারণ করিয়া আছে। সাত্বিক বুদ্ধি দ্বারাই মানব আত্মার একত্ব উপলব্ধি করে ; পক্ষান্তরে মন বহির্বিষয়ের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের বহুত্ব অনুভব করে। জীবাত্মা দেহরথের রথী। বুদ্ধি যথাযথ অশ্বচালনা করিতেছে কি না, জীবাত্মাই সর্ব্বক্ষণ তাহার তত্ত্বাবধান করেন। নচেৎ অশ্বগণ কুপথে গমন করিবে সন্দেহ নাই।

বুদ্ধির হস্তে যিনি ইন্দ্রিয়াশ্বের শাসনরজ্জু রাখিতে অভিলাষ করেন, তাঁহার আত্মার একত্ব বিষয়ে স্থিরলক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। গীতা বলিতেছেনঃ—

"শনৈঃ শনৈরূপরমেৎ বুদ্ধ্যাধৃতি গৃহিতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চল মস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥"

(গীতা ৬ অঃ)

ধৃতিযোগে স্থিরবুদ্ধি করিয়া সহায়।
ধীরে ধীরে শান্তভাব লভিবে ত্বরায়॥
আত্মাতে করিয়া পরে মনের স্থাপন।
কিছু না চিন্তিবে, (রবে স্থাণুর মতন)॥
অস্থির চঞ্চল মন যথা, যথা যাবে।
তথা হতে আনি তারে আত্মায় বসাবে॥

এই অভ্যাসযোগ মানবকে সাধন করিতে হইবে। এই অভ্যাস দ্বারা স্বার্থ-কামনায় দৃঢ়তর বৈরাগ্য আসিবে। যখনই তাঁহার মনে কোন স্বার্থ-কামনার উদ্রেক হইবে, তখনই সেই কার্য্য দ্বারা আর সকলের কি অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তদ্দ্বারা স্বার্থপরতা-বৃদ্ধির জন্য নিজেরই বা কি কি অনিষ্ট হইতে পারে, বিশেষতঃ সেই কার্য্য দ্বারা কি অমঙ্গলপ্রবাহ সমাজ-জীবনে প্রবাহিত হওয়া সম্ভব—তখনই তাঁহাকে এই সকল বিষয় বিচার করিতে হইবে। এইরূপে নিজের ও অন্য সকলের জীবনে স্বার্থ-পরতা কি বিষময় ফল উৎপাদন করে, তাহার চিত্র নিজ মনে অঙ্কিত করিয়া এবং পুরাণাদিতে তদ্রূপ কার্য্যের ফল কিরূপ চিত্রিত আছে, তাহা অনুধ্যান করিয়া, তাঁহার আত্মসংযমশক্তি বর্দ্ধিত হইবে। আরও শাস্ত্রগ্রন্থসকলে যে স্বভাবসিদ্ধ কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার বিষয় নিরন্তর উপদিষ্ট হইয়াছে, তদুভয়ে তিনি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন।

সত্যধর্ম্মনিষ্ঠাই যে একমাত্র কর্ত্তব্য ইহা ভূয়োভূয়ঃ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছেঃ—

"অধার্ম্মিকো নরো যো হি যস্ত চাপানৃতং ধনং।
হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে।
ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকাণাং পাপানাং আশু পশ্যতিপর্য্যয়ং॥

নাধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্ত্তমানস্ত কর্ত্তুর্মূলানি কৃন্ততি।"

(মনু ৪।১৭০)

অধার্ম্মিকা নর যেবা এই ভূমণ্ডলে।
করে ধন উপার্জ্জন যেবা মিথ্যাবলে॥
যা'র হয় সতত হিংসায় রত মন।
এভবে সে সুখলাভ না করে কখন॥
ধর্ম্মপথে থাকি যেই কষ্টে যাপে দিন।
লোভে পড়ি অধর্ম্মে না হয় কভু লীন॥
অধার্ম্মিক আপাততঃ যদি সুখী হয়।
অধর্ম্মের ফল শীঘ্র ঘটিবে নিশ্চয়॥
অধর্ম্মের আচরণ করি ভূমণ্ডলে।
গাভী দুগ্ধ সম ফল তখনি না ফলে॥
কিন্তু ধীরে আবর্ত্তিত ক্রমে ক্রমে হয়।
সমূলে কর্ত্তার নাশ করয়ে নিশ্চয়।

ধর্ম্মই সত্য। কর্ত্তব্য ও পুণ্যানুষ্ঠানই ধর্ম্মের বিশেষত্ব। যাহার যাহা প্রাপ্য—যাহার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা প্রদান করাই ধর্ম্ম। সত্যের নির্দ্ধারণ ও তদনুসারে কার্য্য করাই ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম মানুষের চির সহচর। যখন আর সকলেই তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়, একমাত্র ধর্ম্মই তখন বিশ্বস্ত সহচররূপে অবস্থান করেন; এমন কি মৃত্যুর পরে, অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তরে তাঁহার অনুগমন করেন ও তাঁহাকে গৌরবে ভূষিত করেন। মনু বলিয়াছেনঃ—

"ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোক সহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতিঃ।
ন পুত্রদারা ন জ্ঞাতি ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতং।।
মৃতম শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবাঃ যান্তি ধর্ম্মস্ত মনু গচ্ছতি ॥
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং ॥
ধর্ম্মপ্রধানং পুরুষং তপসা হত কিল্বষং।
পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বং ং খশরীরিণম্ ॥"

(মনু ৪। ২৩৮-৪৩)

কদাচিৎ কোন জীবে না করি পীড়ন।
ধর্ম্মের সঞ্চয় কর, পুত্তিকা যেমন ॥
বল্মীকের স্তুপ করে যতন করিয়া।
পরলোকে যাবে ধর্ম্ম সহায় হইয়া ॥
পিতা মাতা দারা সুত আর পরিজন।
জ্ঞাতি বন্ধু কেহ সঙ্গে না করে গমন।।
একমাত্র শুধু ধর্ম্ম মরণের পর।
জীবের সহায়রূপ রহে নিরন্তর ॥
একাই জনমে জীব একাই মরণ।
পাপ পুণ্য ভোগ করে একাই সে জন ॥
হলে মৃত্যু, দেহ লয়ে জ্ঞাতি বন্ধুগণ।
কাষ্ঠলোষ্ট্রসম ভুমে করয়ে ক্ষেপন ॥
বিমুখ হইয়া ফিরে বান্ধব সকল।
ধর্ম্মই থাকেন তার সহায় কেবল ॥
হেন ধর্ম্মে সহায় করহ নিরন্তর।
ধর্ম্ম বলে পার হবে তিমির দুস্তর ॥
তপস্যায় হত পাপ ধার্ম্মিক যে জন।
দিব্যদেহে করে সেই স্বর্গেতে গমন ॥

এই ধর্ম্মনিষ্ঠায় আগ্রহাতিশয় সনাতন ধর্ম্মের বিশেষত্ব, কারণ ধর্ম্মই একমাত্র সর্ব্বসুখের নিদান। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সনাতন ধর্ম্মের হৃদয়, ন্যায় তাহার প্রধান সুর, ধর্ম্মনিষ্ঠা তাহার মূল মন্ত্র এবং কর্ম্মফলের অখণ্ডনীয়তা তাহার প্রাণ। মানব যেমন কর্ম্ম করে, তেমনই ফল পায়; এক বিন্দু কমও নয়, এক বিন্দু বেশীও নয়, প্রত্যেক ঋণই পরিশোধ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক কর্ম্মেরই অবশ্যম্ভাবী ফল আছে।

কর্ম্মফলতত্ত্ব দৃঢ়রূপে হৃদ্গত হইলে, সন্তোষের উদয় হয় এবং সন্তোষই সর্ব্বসুখের নিদান। অতএব সন্তোষ যাহাতে স্বভাবগত হয়, সে বিষয়ে সকলের যত্ন করা উচিত। মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে :—

"সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥"

(মনু ৪।১২)

পরম মঙ্গলকর সন্তোষ স্বভাব।
সুখার্থী সংযত হয়ে আচরিবে তায়॥
সন্তোষ সুখের মূল, জেনো এ ধরায়।
হয় সদা অসন্তোষে দুঃখ আবির্ভাব॥

সন্তোষস্বভাব ব্যক্তি নিতান্ত দুঃখের অবস্থায়ও সন্তুষ্ট থাকেন, কারণ সুখ তাঁহার অন্তরে—বাহিরে নয়। পরন্তু অতৃপ্তস্বভাব ব্যক্তিবিশেষ সুখের অবস্থায়ও অসন্তোষের কারণ খুঁজিয়া বাহির করেন। ভূমণ্ডলে আমাদের অপেক্ষা হয় পদে, না হয় ধনে, না হয় সৌভাগ্যে বড় অনেক আছেন; সুতরাং মূঢ় ব্যক্তির অসন্তোষের কারণের কখনও অসদ্ভাব নাই। নিজ কর্ম্মফলে যাহা পাইয়াছি তাহাতে সন্তুষ্ট থাকাই বিজ্ঞের লক্ষণ। আমি যাহা পাইবার অধিকারী নই, তাহা না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট হওয়া মূর্খতা মাত্র।

যদ্বারা জীবাত্মাসমূহের মধ্যে পরস্পরানুকূল সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সদ্গুণ বলা হইয়াছে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, অত্রাধ্যায় লিখিত ব্যক্তিগত গুণগুলি সদ্‌গুণ পদবাচ্য নহে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এগুলি কেবল ব্যক্তিগত উন্নতিবিধায়ক বলিয়া বোধ হয়, তথাপি একটু প্রণিধান করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ইহারাও অন্ততঃ গৌণভাবে অপর সকলের সুখ লাভের হেতু। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ক্রমাভিব্যক্তি প্রভৃতি কখনও একটীমাত্র জীবকে আশ্রয় করিয়া হইতে পারে না। উহারা সকলেই সমাজজীবন বা সঙ্গসাপেক্ষ। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, নিজের প্রতি কোন কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিলে, তদ্বারাই অপরের কোন না কোন উপকার সাধিত হয়, ইহা নিশ্চয়। মনে কর, তুমি শুদ্ধাচারী নহ; তাহা হইলে তোমার প্রতিবেশীগণকে—যাহাদের সংস্পর্শে তোমাকে সর্ব্বদা আসিতে হয়—তজ্জন্য অসচ্ছন্দ ভোগ করিতে হয়। আবার তুমি শুদ্ধাচার অবলম্বন করিলে, তোমার প্রতিবেশীগণের সে অসুবিধা দূর করা হইল। এই যুক্তিবলে বুঝিতে পারিবে যে, যখন তোমাকে কেহ বলে তোমার "নিজের প্রতি এই কর্ত্তব্যটী করা উচিত", তাহার অর্থ এই সমগ্র মানবজাতির সহিত তুমি একাত্মা বিধায় সকলের উন্নতির সহিত তোমার উন্নতি বিজড়িত থাকায়—তোমার এই নিজের উন্নতি সাধন কর্ত্তব্য। একের উন্নতিতে যখন সকলের উন্নতি নিহিত রহিয়াছে—একের উন্নতি বা অবনতিতে যখন অপর সকলের উন্নতি বা অবনতি অবশ্যম্ভাবী, তখন ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য যে নিশ্চয়ই সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যসূচক, তাহা বলা বাহুল্য। দুষ্টাচারী ব্যক্তি প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে নিজের অনিষ্ট করে, পরে সমাজে কুদৃষ্টান্তস্বরূপ সংক্রামক ব্যাধি প্রবর্ত্তন করিয়া পরোক্ষভাবে অপর সকলের অনিষ্ট করে।

এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয়াংশে কিরূপে পঞ্চ যজ্ঞদ্বারা দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, নরগণ ও ভূতগণের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয়, তাহার সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সর্ব্বপ্রকার জীবাত্মার প্রতি অহিংসাই আমাদের পরম ধর্ম্ম। ভীষ্মদেব বলিয়াছেন ঃ—

"অহিংসা পরোমধর্ম্মঃ।"

(মহাভারত অনুশাসন ১১৪)

ভগবান মনুও বলিয়াছেনঃ—

"যস্মাদয়্পি ভূতানাং দ্বিজান্নোৎপদ্যতে ভয়ং।
তস্য দেহাদ্বিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কুতশন॥

(মনু ৬।৪০)

যে দ্বিজ হইতে কাহারও পরাণে
ভয় নাহি উপজয়।
দেহ মুক্ত হলে কখন তাঁহার
কাহা হতে নাহি ভয়॥

ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ। অহিংসকের কাহারও নিকট হিংসা পাইবার সম্ভাবনা নাই। যোগীগণ নির্ভয়ে নিরাপদে শ্বাপদগণের মধ্যে বিচরণ করেন, কারণ তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বজীবপ্রেমে পূর্ণ; তাঁহারা ভয়ের হেতু নহেন। ভীষ্মদেব আর একস্থানে বলিয়াছেন যে "হত্যাকারীই হত হয়"— যে অন্যকে হত্যা করে নাই, কেহ তাহাকে হত্যা করিতে পারে না। সর্ব্বজীবে প্রেমপূর্ণ অহিংসক ব্যক্তি আপন আত্মাকে সর্ব্বভূতের অন্তরে দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে নিজ দেহেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্বরূপ জ্ঞান করেন, সুতরাং তিনি সকলের বন্ধু ও সর্ব্বত্র নিরাপদ।

কেবল স্বার্থ ত্যাগ বা আত্মোৎসর্গ (যজ্ঞ) দ্বারাই যে সর্ব্বভূতের মধ্যে পরস্পরানুকূল সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং এই সৌহার্দ্দবর্দ্ধনই যে ক্রমাভিব্যক্তির মূলমন্ত্র, ইহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। মানব স্বার্থপর হইতে পারে না। জগৎ
স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু যদি তিনি স্বেচ্ছায় ভগবতেচ্ছার —ভগবৎবাণী বা প্রণববাক্যের—প্রতিকূলাচরণ করেন, তবে তাঁহার দুঃখ ও কষ্ট অবশ্যম্ভাবী। পুনঃ পুনঃ দুঃখ ও সন্তাপ ভোগ করিতে করিতে তাঁহার স্বার্থান্ধতা ঘুচিয়া যায় এবং তখন তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত একপ্রাণ হন।

শিক্ষার্থীরা এই তত্ত্বটী দৃঢ়রূপে হৃদ্গত করিয়া রাখিলে পরবর্ত্তী অধ্যায়ের বক্তব্য তাঁহাদের সহজবোধ্য হইবে।

অষ্টম অধ্যায়।

মানবজাতির পরস্পরের সম্বন্ধে গুণ ও দোষ সকল।

গুরুজনের প্রতি ব্যবহার।

রাগ ও দ্বেষ হইতে পুণ্য ও পাপের উৎপত্তি বলা যাইতে পারে। অনুরাগ বা প্রেম মানুষকে স্বার্থত্যাগ করিতে, আত্মপ্রেমকে সমঙ্কুচিত করিতে ও আত্মহিতকে সমাজহিতের অধীন করিতে প্রবৃত্ত করে। প্রেম আত্মা হইতে উৎপন্ন এবং আনন্দেরই রূপান্তর। তাই প্রেম ও কর্ত্তব্যপালন ও স্বার্থত্যাগকে আহ্লাদের বিষয়ে পরিণত করে।

প্রথম প্রথম হৃদয়াবেগ সকল বিধিনিষেধের বাধ্য থাকে না; বস্তুতঃ তখন বিধিনিষেধ জানাও থাকে না। পরে যখন বিধিনিষেধের জ্ঞানও উপলব্ধি হয়—যখন চিৎ ও আনন্দের মিলন হয়, যখন হৃদয়াবেগসকল আত্মার বিবেক-কেন্দ্র হইতে উদ্ভূত হয়—আরও পরে, যখন সেই আত্মা-কেন্দ্র বিশ্বকেন্দ্রে পরিণত হয়, তখন প্রত্যেক হৃদয়াবেগই পূণ্যপ্রবৃত্তি—বিবেকবাণী বা ভগবৎ-বাণী স্বরূপ হয়।

যেমন সকল সদ্গুণের মূল প্রেম, তেমনি সকল বিদ্বেষ বা ঘৃণাই সকল দোষের মুল। কারণ মিলন অর্থাৎ একত্ব সাধনই জগতের নীতি—ঐশ্বরিক নীতি; সুতরাং পৃথক-করণ বা পার্থক্য বুদ্ধি সেই নীতিগর্হিত। সহানুভূতি বা একপ্রাণতাই ক্রমোন্নতি; অসহানুভূতই অবনতি।

যদি আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রেম-প্রণোদিত হয়, তাহা হইলে আমরা স্বভাবতই ঐ সম্বন্ধকে প্রীতি ও আনন্দজনক করিবার জন্য স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত হই।

মানব জাতির পরস্পর সম্বন্ধজনিত গুণ ও দোষ সকল বিভিন্ন শ্রেণীর সম্বন্ধানুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। যথাঃ— (১) গুরুজনের প্রতি ব্যবহার (২ তুল্যব্যক্তির প্রতি ব্যবহার। (৩) নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার।

ঈশ্বর, রাজা, পিতামাতা, শিক্ষাদাতা ও বয়োবৃদ্ধগণ স্বভাবতই আমাদের শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। এতদ্ব্যতীত মানবের "নৈমিত্তিক গুরু" থাকিতে পারে। পিতামাতা ও শিক্ষকের সমপর্য্যায়ের ব্যক্তিগণ এবং আপনার অপেক্ষা জ্ঞান ও নীতিবান ব্যক্তিগণকে "নৈমিত্তিক গুরু" বলা যাইতে পারে। নৈমিত্তিক গুরুর প্রতি ব্যবহার, স্বাভাবিক গুরুর প্রতি ব্যবহারের অনুরূপ হইবে। তজ্জন্য "নৈমিত্তিক গুরুর" আর শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজন নাই।

ঈশ্বর-প্রেম শ্রদ্ধা ও গৌরবের পরাকাষ্ঠারূপে প্রকটিত হয়। মুখ্যতঃ ইহা পূজার্চ্চনারূপে প্রকাশিত হয়; গৌণভাবে ইহা ঈশ্বর সম্বন্ধী সমস্ত বিষয়ে—তৎসম্বন্ধী সর্ব্বপ্রকার মনোভাবে, তাঁহার পূজার উপকরণে, পূজার স্থানে, পূজার বিভিন্ন প্রণালীতে—সম্ভ্রম ও সম্মানের উৎপাদন করে। ঈশ্বর জীবাত্মা হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই এবং তাঁহার অনুত্তম প্রজ্ঞা ও দয়া গুণে মুগ্ধ হইয়াই, জীব সকল তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ঈশ্বরের প্রতি জীবের গৌরব ও মর্য্যাদার সহিত তাহার দীনতা বা আত্ম-লঘুত্বজ্ঞান, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা ও আত্মসমর্পণেচ্ছা মিশ্রিত থাকে। ঈশ্বরের তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি হওয়াতেই দীনতার আবির্ভব হয়। কিন্তু এ দীনতায় ঈর্ষাজনিত খেদ থাকে না! কারণ যিনি অনন্তগুণে বড় তাঁহার সম্বন্ধে ঈর্ষা হয় না; বরং তাঁহার অনুগামী হইতে —তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ভাগী হইতে অভিলাষ হয়। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বে, সর্ব্বশক্তিমত্তায় ও সর্ব্বাশ্রয়ত্বে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকাতেই জীব

তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে চায় এবং তদুদ্দেশে আত্মসমর্পণ করিতে বাসনা করে। আর তাঁহার অপার করুণার কথা চিন্তা করিয়া মানুষ কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয় এবং ভগবৎসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া কৃতার্থমন্য হয়। ঈশ্বর প্রেমের ফলস্বরূপ এই সদ্‌গুণগুলির—সম্মান, আত্মদীনতা, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস, তদনুবর্ত্তিতা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও তদর্থে আত্মবলিদান—এই গুণ সকলের অনুশীলন ও পূর্ণত্বসাধন করিলেই আমাদের ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য-পালন করা হয়।

হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থসকলে অনেকানেক ভক্ত মহাপুরুষের কাহিনী বিবৃত আছে। তাঁহাদের চরিত্রে ঐ সকল গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাঁহাদের অলৌকিক ঈশ্বরপ্রেমের আদর্শ সকলেরই অধ্যয়ণ ও অনুধ্যান করা উচিত। ভীষ্মদেব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আহত হইয়া শরশয্যায় শয়ান অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করা ও ধ্যান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

প্রহ্লাদ অলোকসামান্য ভক্তিবলে সকল উপদ্রব জয় করিয়া ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেনঃ—

ওহে ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছায়
যে জন্মে যে দেহ পাই।
মানব কি পশু পতঙ্গ কি কীট
তাহে মোর চিন্তা নাই॥
হে অচ্যুত শুধু এই ভিক্ষা পদে
সকল জনমে যেন।
ভকতি অচলা তব পদে রহে
বাসনা হৃদয়ে হেন॥
সংসারের জীব পার্থিব বিষয়ে।
মগ্ন থাকে যেই মত।

আমার হৃদয় যেন সেই মত
তব পদে থাকে রত ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ১।২০)

"মহাত্মানাস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ং ॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো। মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখ্যং ॥"

(গীতা ৯।১৩-১৫)

শুন পার্থ এই ভাবে মাহাত্ম্য নিচয়।
আমায়, প্রকৃতি দৈবী করিয়া আশ্রয় ॥
অব্যয় ভূতাদিরূপে জানিয়া আমারে।
অনন্য মানসে ভজে শ্রদ্ধা সহকারে ॥
হয়ে যত্নবান অতি আর দৃঢ়ব্রত।
করিয়া আমার কথা কীর্ত্তন সতত ॥
ভক্তি ভরে পদে মোর করি নমস্কার।
নিত্যযুক্ত হয়ে করে পূজন আমার ॥
জ্ঞান যজ্ঞে কেহ মোরে করেন পূজন।
এক আমি, বহু আমি, ব্যাপিত ভুবন ॥

পুনশ্চ

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব সমন্বিতাঃ ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥
তেষাং সতত যুক্তানং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।"
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুযান্তিতে ॥

(গীতা ১০।৮-১০)

আমি সে সবার হই উদ্ভব কারণ।
আমা হতে প্রবর্ত্তিত নিখিল ভুবন॥
ইহা জানি বুধগণ সতত আমারে।
ভাবযুক্ত প্রাণে ভজে শ্রদ্ধা সহকারে॥
মন্মনা মদ্গত প্রাণহইয়া সতত।
পরস্পর প্রবোধনে তাঁরা সবে রত।
সতত আমার কথা করিয়া কীর্ত্তন।
তুষ্টপ্রাণ হয়ে সদা করেন রমণ॥
এরূপে সতত যুক্ত যাঁরা মোর প্রতি।
ভজেন আমারে সদা হয়ে প্রীত মতি॥
তাঁদের হৃদয়ে করি বুদ্ধিযোগ দান।
যার ফলে আমাতেই করেন প্রয়াণ॥

ভক্তির পাত্রকে সর্ব্বদা ধ্যান, তাঁহার পূজা, তাঁহার বিষয় অধ্যয়ণ, কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে এবং নিরন্তর তদ্ভক্ত সাধুগণের সহবাস করিলে ভক্তির পুষ্টিসাধন হয়। ভগবান বলিয়াছেনঃ—

"যে তু সর্ব্বানি কর্ম্মানি ময়ি সংন্যাস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাং॥

(গীতা ১২।৬-৭)

যারা সর্ব্ব কর্ম্ম মোরে করিয়া অর্পণ।
মৎপর হইয়া করে আমার অর্চ্চন॥
হইয়া অনন্যমনা একযোগ করি।
উপাসনা করে মোরে হৃদয়েতে ধরি॥
মৃত্যুময় সংসার সাগরে তা সবার।
আমিই উদ্ধারকর্ত্তা জেনো ইহা সার॥
আমাতে আবিষ্ট চিত্ত করেছে যেজন।
অচিরে হইব তার উদ্ধার কারণ॥

যে শ্রেষ্ঠ পুরুষকে আমি একান্ত ভালবাসি, স্বভাবতই তাঁহার পদানুসরণ করিতে আমার বাসনা হয়। আবার যদি সেই আদর্শ পুরুষ স্বয়ং ঈশ্বর হন, তাহা হইলে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে যে আমার ঐকান্তিক আগ্রহ হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। জ্ঞান ও সহানুভূতিই আনুগত্য জন্মাইয়া থাকে, কারণ জ্ঞানের দ্বারা সৎপন্থা প্রদর্শিত হয় এবং সহানুভূতি সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথের ব্যবস্থা করে। ঈশ্বর পূর্ণজ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা ও অনন্ত দয়ার আধার; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরানুগামিতা যে আমাদের নিরতিশয় শ্রেয়ঃ ও প্রিয় হইবে, ইহার কি আর অন্যথা আছে? যখন জীবনের সকল ঘটনা সেই দয়াময়ের ইচ্ছাধীন বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন তদুদিত সুখ দুঃখ সমভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য হইবে। পুত্র যেরূপ জ্ঞানী ও স্নেহময় পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, জীবাত্মাও (তদপেক্ষা বহুতর গুণে) সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞ ও করুণাময় পরম পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। ভগবান বলিয়াছেনঃ—

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
ভর্ত্তা নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ॥"

(গীতা। ৯ অঃ)

পিতা আমি এই জগতের,
মাতা ধাতা আর পিতামহ
ভর্ত্তা বাস শরণ সুহৃৎ।

এ হেন ঈশ্বরে কাহার না কৃতজ্ঞতা প্রবাহিত হয়? যতই তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারি, ততই কৃতজ্ঞতা অধিকতর উচ্ছ্বাসে তাঁহার প্রতি ধাবিত হয় এবং অবশেষে আত্মসমর্পণ ও একেবারে আত্মবলিদানে সেই ভক্তি পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। দিনের পর দিন সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণ করিতে করিতে আত্মোৎসর্গ শিক্ষা হয় এবং আত্মোৎসর্গের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে আমিত্ব ঘুচিয়া ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণং ॥"

(গীতা ৯।২৭)

যেই কর্ম্ম কর, যাহা করহ আহার।
যাহা হোম কর, যাহা দান কর আর ॥
যা কিছু তপস্যা কর হে কুরুনন্দন।
সে সকল আমাতেই করহ অর্পণ ॥

উপরিলিখিত সদ্‌গুণ গুলি যেমন প্রেমপ্রসূত শ্রদ্ধার ফল, তেমনি তদ্বিপরীত দোষসকল শ্রেষ্ঠজনের প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণাপ্রসূত ভয়ের ফল। বিদ্বেষ বশতঃ নিরন্তর শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণকে লঘু করিবার চেষ্টা, তাঁহাদিগকে নিজের সমান ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য এই যে আর তাঁহাদিগকে ভয় করিতে হইবে না। কারণ কোন অধিক ক্ষমতাশালী শত্রুর সম্মুখীন হইলে পাছে তাঁহার শক্তির প্রয়োগে আমরা ধ্বংস হই, সহজেই এই ভয় আমাদের হৃদয়ে উদ্ভূত হয় এবং যাহাতে তাঁহার শক্তির হ্রাস হয় অথবা যাহাতে তাহা আমাদের স্পর্শ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে স্বভাবতঃ আমরা যত্নবান হই।

ঈশ্বরবিদ্বেষ স্বভাবতই তাঁহার অনন্তশক্তি, তাঁহার মহত্ত্বকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক এবং তাঁহার লঘুতা প্রতিপাদনে যত্নবান। সাধারণতঃ এই দোষ ঈশ্বরে অগৌরব ও অভক্তি রূপে প্রকাশ পায়। পবিত্র বিষয়, পবিত্র স্থান ও পবিত্র বস্তু সম্বন্ধে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাজনক বাক্য প্রয়োগ এবং অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি শ্লেষ ও বিদ্রূপ করা এরূপ লোকের অভ্যাস। অপেক্ষাকৃত রূঢ় স্বভাবের মানবে এই অভ্যাস ধর্ম্মগ্লানিরূপে পরিণত হয় এবং তদ্দ্বারা তাহার উচ্চ হৃদয়াবেগ সকল বিনষ্ট হয়। উচ্চ হৃদয়াবেগ নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের সহিত তাহার চিরশত্রুতা জন্মে। প্রেমগর্ভ হৃদয়াবেগ ও সদ্‌গুণ সকল দ্বারাই ঈশ্বর লাভ হয় এবং যতই মানুষ তাহা-

দিগকে ছাড়িয়া ঈশ্বরবিদ্বেষী হয়, ততই সে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া শেষে নাস্তিকতা ও দুর্নীতির কবলগ্রস্ত হইয়া থাকে।

অসত্যম প্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরণীশ্বরং।

(গীতা ১৬।৮)

অপ্রতিষ্ঠ অসত্য জগৎ নিরীশ্বর।
আপনা আপনি চলে বিশ্ব চরাচর॥
ঘোর অবিশ্বাস হৃদে করিয়া আশ্রয়।
অসুরপ্রকৃতি লোকে এইরূপ কয়॥

ভগবদ্ভক্তির পরেই রাজভক্তির স্থান। ইহ সংসারে রাজা ঈশ্বরের শক্তির, ন্যায়পরতার ও প্রজাপালনভারের প্রতিনিধিস্বরূপ। সর্ব্বতোভাবে প্রজারঞ্জন করেন বলিয়া তাঁহার নাম রাজা এবং যিনি যথার্থ রাজপদবাচ্য তিনি নিজ সুখ ও স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া নিরন্তর প্রজার হিতকামনায় আত্মোৎসর্গ করেন। পুরাকালে এতদ্দেশে যে সমস্ত আদর্শ নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবনীসকল এই রাজধর্ম্মের পূর্ণ দৃষ্টান্তস্বরূপ অদ্যাপি জাজ্জ্বল্যমান আছে। উপরে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবের যে সকল সদ্‌গুণ আচরণীয় বলা হইয়াছে, কিঞ্চিদূন পরিমাণে সে সমুদায় রাজা প্রজা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। রাজভক্তি, বিশ্বস্ততা ও রাজাজ্ঞাপালন প্রজার ধর্ম্ম। প্রজাপুঞ্জের এই সকল গুণ না থাকিলে কোন জাতি (Nation) মহৎ হইতে পারে না। মনু বলিয়াছেন, পরমেশ্বর রাজাকে ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, সোম, কুবের এই অষ্ট লোকপালের অংশ লইয়া সৃষ্টি করেন। রাজা ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যে কৃপাবৃষ্টি করিবেন, বায়ুর ন্যায় সর্ব্বগ হইয়া সর্ব্ববিষয়ের সংবাদ রাখিবেন, যমের ন্যায় ধর্ম্মদণ্ডে প্রজার শাসন করিবেন, সূর্য্যের ন্যায় করগ্রহণপূর্ব্বক প্রজাপালন করিবেন, অগ্নির ন্যায় তেজোময় ও বিক্রান্ত হইবেন, বরুণের ন্যায় দুষ্টের বন্ধন ও

দমন করিবেন, চন্দ্রের ন্যায় প্রজার আনন্দবর্দ্ধন করিবেন এবং কুবেরের ন্যায় ধনদানে প্রজাপোষণ করিবেন। ভীষ্মদেব রাজধর্ম্মানুশাসন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, রাজা প্রজার পক্ষে ঈশ্বর সদৃশ, কেন না তিনিই এ পৃথিবীতে সবার পালক ও রক্ষক।

রাজভক্ত প্রজামণ্ডলী সুরাজার শাসনে কিরূপ সুখ ও সমৃদ্ধিশালী হয় তাহার বহুল দৃষ্টান্ত রামায়ণাদি ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

রাজভক্তি যেমন বহুসুখের আকর, তেমনি রাজবিদ্বেষ, গুপ্তচক্রান্ত ও বিদ্রোহিতা বহু দুঃখকর বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অরাজক জনপদের সর্ব্বাঙ্গীন দুরবস্থার কথাও ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে।

দেশহিতৈষণা (Patriotism) এই গুণের (অর্থাৎ রাজভক্তির) সমধর্ম্মী বা নিকটধর্ম্মী। স্বদেশের জনসমষ্টিকে একব্যাক্তি জ্ঞানে তাঁহার সেবা ও ইষ্টকামনাকে দেশহিতৈষণা কহে। রাজাও প্রকৃতপক্ষে ঐ জন সমষ্টির প্রতিনিধি; সুতরাং বিশুদ্ধ দেশহিতৈষণা হইতেই রাজভক্তির উৎপত্তি বলা যাইতে পারে।

দেশহিতৈষণার মূল কয়েক প্রকার হৃদয়াবেগে নিহিত; জন্মভূমির প্রাচীন কীর্ত্তির গৌরব, স্বদেশের ধর্ম্মবীর, যুদ্ধবীর ও অন্যান্য মহাত্মাগণের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা, স্বদেশবাসীর প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতি—তাঁহাদের সুখ দুঃখে, জয় পরাজয়ে, সম্পদ বিপদে সম্পূর্ণ সমবেদনা এবং জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও শিল্প বিজ্ঞানের ঔৎকর্ষে আত্মগৌরব জ্ঞান প্রভৃতি হৃদয়াবেগ হইতেই স্বদেশহিতৈষণার আবির্ভাব হয়। জন্মভূমিই আদর্শভূমি অর্থাৎ সকল দেশের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ—পরম ভক্তি ও গৌরবের স্থান। মানব যেমন পিতামাতার সন্তান, তেমনি জন্মভূমির সন্তান—যেমন মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করিয়া তাঁহার শোণিতে পরিপুষ্ট হয় ও তাঁহার স্নেহে

লালিত পালিত হয়, সেইরূপ জন্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই জল বায়ু, শস্যে পরিপুষ্ট হয় এবং তাঁহারই অঙ্কে পালিত ও শিক্ষিত হয়—তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী", জননী ও জন্ম-ভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তাই জন্মভূমির কার্য্যে, জন্মভূমির সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে—সুখ, সম্পদ, ধন, মান, প্রাণ, শুধু নিজের প্রাণ নয়, সন্তান সন্ততি, পরিজনসমূহের প্রাণ পর্য্যন্ত, সকলই অকাতরে জন্মভূমির পদে উৎসর্গ করিতে সকলেই অভিলাষী। জন্মভূমি একজন দেশহিতৈষী সন্তানের ক্ষমতার পক্ষে অনেক বড় হইতে পারে, তথাপি তাঁহার সেবা পূজার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে এবং প্রত্যেকেই অল্পাধিক তদুন্নতি সাধনে সক্ষম। স্নেহময় পিতা যেমন পরিবারবর্গের মঙ্গলের জন্য আত্ম-সুখ বলিদান করেন, তেমনি দেশহিতৈষী দেশের কল্যাণের জন্য নিজ স্বার্থ বলিদান করেন। সমাজহিতৈষণা বা (Public spirit) দেশহিতৈষণারই নামান্তর। যে ব্যক্তি সাধারণের হিতার্থে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষতি স্বীকার করেন, তিনিই সমাজহিতৈষী বা (Public spirited) ব্যক্তি। "সমাজহিতৈষণা" এই শব্দ দ্বারাই সেই নীতিবিজ্ঞানের মূলমন্ত্র অর্থাৎ সর্ব্বভূতের একাত্মতা সূচিত হয়। সমাজহিতৈষী নিজ মনে স্পষ্ট উপলব্ধি করুন আর নাই করুন, তিনি সমাজের সর্ব্বাত্মার একত্ব অনুভব করেন বলিয়াই সকলের মঙ্গলান্বেষণে ব্যাকুল। যিনি জানেন যে, সমাজের এক জনের ভাল মন্দের সঙ্গে সকলের ভাল মন্দের সম্পর্ক আছে এবং তদনুসারে নিজ জীবনকে নিয়মিত করিতে পারেন, তিনিই ধন্য।

পূর্ব্বেই ঈশ্বর সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং রাজা ও রাজ্য সম্বন্ধে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রত্যেকেই নিজ মানসিক ও বাহ্যিক কার্য্যসমূহের নৈতিকতা

সম্বন্ধে অনুক্ষণ প্রকৃষ্ট কারণ নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য। আবার আমরা নিজ কার্য্যের দোষ গুণের জন্য যেরূপ দায়ী, সেইরূপ পরে কোন বিশেষ নীতি-গর্হিত কার্য্য করিলে তজ্জন্যও আমাদের সকলের দায়িত্ব আছে---তাহার পরিহারের বা প্রতিকারের চেষ্টা করিতে আমরা সকলেই বাধ্য। এবং ব্যক্তিগত বা সামাজিক কার্য্য সম্বন্ধে সাধারণের মতে বিনা বিচারে মত দেওয়া কাহারও উচিত নহে। অপরে ভাল বলিলেও যাহা নিজের বুদ্ধিতে দোষাবহ বলিয়া বোধ হয়, অথবা যাহার ঔচিত্য সম্বন্ধে নিজের মনে সন্দেহ হয়, এরূপ বিষয়ে প্রত্যেককেই বিশেষ বিচার করিয়া চলা কর্ত্তব্য। কপট রাজভক্তি অর্থাৎ তোষামোদকারীর ভণ্ডরাজভক্তি আরও অধিক বিপজ্জনক ও পাপাশয়। শুভাকাঙ্খী মন্ত্রীর স্পষ্ট প্রতিবাদ যে তদপেক্ষা ভাল, ইহা বলা বাহুল্য। সেইরূপ একপ্রকার কপট দেশহিতৈষণা আছে যাহা কেবল অজ্ঞ জনসাধারণের কুসংস্কারের পোষকতা করিয়া দেশের ও দশের প্রকৃত উন্নতির অন্তরায় হয়।

"সুলভাঃ পুরুষা রাজন সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥

(রামায়ণ ৬ ১৬)

সর্ব্বদাই প্রিয় বাক্য বলে যেই জন।
এমন পুরুষ সুখলভ্য হে রাজন॥
অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যচয়।
বক্তা শ্রোতো সুদুর্লভ জানিও নিশ্চয়॥

দেশহিতৈষণা ও সমাজহিতৈষণা (সাধারণের হিতকর কার্য্যে তৎপরতা) রূপ গুণদ্বয় মনের প্রসার বর্দ্ধিত করে ও চরিত্রের ঔৎকর্ষ সাধন করে। এইরূপে বহুব্যষ্টি আত্মাতে একত্ব অনুভব দ্বারা ক্রমশঃ মানব অখণ্ড পরমাত্মার উপলম্ভনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। সমাজ

ও দেশহিতৈষী লোক সাধারণ সঙ্কীর্ণ হৃদয় গৃহস্থ অপেক্ষা ঈশ্বরের সন্নিকট। সঙ্কীর্ণ মনে ভগবানের স্ফূর্ত্তির স্থান হয় না। দেশহিতৈষীর আমিত্বের প্রসার হইতে অবশেষে বিশ্বহিতৈষণায় (Philanthrophy) উপনীত হয়। যে দেশের সন্তানেরা স্বদেশপ্রেমিক, সেই দেশ চিরধন্য; তাহার সুখের ও গৌরবের অবধি নাই। সে দেশ অচিরে জগতের পূজ্য ও আদর্শ হয়।

এক্ষণে আমরা পিতামাতা ও শিক্ষকগণের প্রতি কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। উপরে যে সকল সদ্‌গুণ ঈশ্বরের ও রাজার প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সে সকলই পিতামাতা ও শিক্ষকগণের পক্ষে প্রযোজ্য; তদ্ব্যতীত তাঁহাদের সম্বন্ধে নম্রতা ও মধুরতা, অবিচলিত বিশ্বাস ও শিক্ষনীয়তা থাকা একান্ত আবশ্যক। পিতামাতা ও শিক্ষক সম্বন্ধে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সর্ব্বত্র যত বিশিষ্টভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, তত বোধ হয় অন্য কোন বিষয়ে হয় নাই এবং যথার্থ আর্য্যসন্তানের এই বিশেষত্ব অদ্যাপি প্রোথিত রহিয়াছেঃ—

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে॥
তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রুষা পরমং তপ উচ্যতে।
ন তৈরনভ্যনুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ॥
ত এব হি ত্রয়ো লোকাস্ত এব ত্রয়আশ্রমাঃ।
ত এব হি ত্রয়ো বেদাস্ত এবোক্তাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥

*　　*　　*

ত্রিষপ্রমাদ্যন্নেতেষু ত্রীংল্লোকান্বিজয়েদ্গৃহী।
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দেববদ্দিবি মোদতে॥

সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
যাবৎ ত্রয়স্তে জীবেয়ুস্তাবন্নান্যং সমাচরেৎ।
তেষ্বেব নিত্যং শুশ্রূষাং কুর্য্যাৎপ্রিয়হিতে রতঃ॥

*　　*　　*

ত্রিষ্বেতেষ্বিতি কৃত্যং হি পুরুষস্য সমাপ্যতে।
এষ ধর্ম্মঃ পরঃ সাক্ষাদুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে॥

(মনু ২)

*

যত দুঃখ পিতামাতা সহে শিশু তরে।
শত বর্ষে পুত্র তাহা শোধিবারে নারে॥
পিতামাতা আচার্য্যের প্রিয় আচরণ।
উচিত সতত করা হয়ে এক মন॥
তাহারা হইলে হৃষ্ট, জানিবে নিশ্চয়।
মানবের তপ, যজ্ঞ, সব পূর্ণ হয়॥
তাদেরি শুশ্রূষা হয় তপস্যা পরম।
তাদের আদেশ হলে, অপর ধরম॥
তাহারাই তিনলোক আশ্রম ত্রিতয়।
তিন বেদ, তিন অগ্নি জানিহ নিশ্চয়॥

*　　*　　*

গৃহী যদি এ তিনেরে অবজ্ঞা না করে।
তিন লোক জয় তার ঘটিবে সত্বরে॥
তেজোময় স্বশরীরে করিয়া গমন।
দেবগণ সহ স্বর্গে আনন্দেতে র'ন॥

*　　*　　*

সাদরে এদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ফল লাভ হয় জেনো মনে॥

এ তিনের প্রতি কারু কর্ত্তব্য হেলন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম বৃথা নিস্ফল জীবন ॥
যত দিন এই তিন রহেন জীবিত।
প্রাণপণে তাঁহাদের শুশ্রূষা বিহিত ॥
তাঁদের মঙ্গল, প্রিয়কার্য্য সদা করে।
অনায়াসে তরে যাবে এ ভব সাগরে ॥

* * *

এ তিনের পূজনে সকলি সিদ্ধ হয়।
তাহাই পরম ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয় ॥
আর যত ধর্ম্ম শুন নিখিল সংসারে।
উপধর্ম্ম বলি তুমি জেনো সে সবারে ॥

শিক্ষার্থী সর্ব্বতোভাবে আচার্য্যের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে এবং নিরন্তর তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষা সাদরে অভ্যাস করিবে। শাস্ত্রে আচার্য্যের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক বিধি আছে। শিষ্য অনুক্ষণ আচার্য্যের সেবা-পরায়ন থাকিবে এবং কখনও তাঁহার বিরক্তিজনক কোন কার্য্য করিবে না। আর্য্যশাস্ত্রে আচার্য্যকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিতে উপদিষ্ট হইয়াছে :—

"উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতং ॥"

(মনু ২ ২০৬)

জন্মদাতা ব্রহ্মজ্ঞান দাতা, দোঁহে পিতা।
শেষোক্ত দোঁহার শ্রেষ্ঠ নাহিক অন্যথা ॥
ব্রহ্মজন্ম ব্রাহ্মণের অনন্ত নিশ্চয়।
ইহ পরলোকে তাহা তুল্য রূপ হয় ॥

কেবল কর্ত্তব্যপরায়ণ শিষ্যকেই জ্ঞানদানের বিধি আছে :—

"যথা খনন্ খনিত্রেন নরো বার্য্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরু-গতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি ॥"

(মনু২ ২০৭)

খনিত্রে খনন করি যথা নরগণ।
বারিলাভ করি সবে হয় তুষ্টমন॥
গুরুর শুশ্রুষা তথা করিয়া যতনে।
গুরুগত বিদ্যালাভ করে নরগণে॥

পিতা মাতা ও আচার্য্যের প্রতি দ্বেষপরায়ণ হইলে বহুবিধ দোষের উৎপত্তি হয়। যেমন ঈশ্বর ও রাজা সম্বন্ধে প্রযুজ্য সৎগুণসকল পিতা মাতা ও আচার্য্য সম্বন্ধেও প্রযুজ্য বলা হইয়াছে, তদ্রূপ ঈশ্বর-বিদ্বেষ হইতে যে সমস্ত দোষের উৎপত্তি হয়, পিতা মাতা ও আচার্য্যের বিদ্বেষ হইতেও সেই সমস্ত দোষের আবির্ভাব হয়। পিতা মাতা ও আচার্য্য-বিদ্বেষ হইতে অধিকন্তু সন্দিগ্ধচিত্ততা, কাপুরুষতা, মিথ্যাচারিতা ও প্রগল্-ভতার উৎপত্তি হয়। অপরকে আপনা অপেক্ষা বলবান জানিলে সহজেই সন্দেহ হয়, পাছে প্রবলের শক্তি আমার হিতকামনায় প্রযুক্ত না হইয়া আমার অনিষ্ট সাধনে নিয়োজিত হয়। এরূপ সন্দিগ্ধচিত্ততা—অর্থাৎ অন্যের সকল বিষয়েই তাহার দুরভিসন্ধি অনুমান করার স্বভাব—মানব-সমূহের পরস্পর সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ যেরূপ দূষিত ও বিষাক্ত করে, তেমন বোধ হয় আর কিছুতেই করে না। দুরভিসন্ধি ও সন্দেহকারী অপরের সকল কার্য্যের উপর মিথ্যাভাব আরোপ করে, সকল বিষয় বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করিয়া নিতান্ত নির্দ্দোষ বিষয়েও দোষ অনুভব করে। সন্দিগ্ধ স্বভাব ব্যক্তি সর্ব্বত্রই দুরভিসন্ধি আঘ্রাণ করে ও মিথ্যা ভয় কল্পনা করিয়া অনর্থক কষ্ট সহ্য করে। কাপুরুষতা হইতে মিথ্যাচারের উৎপত্তি হয়; পাছে কোন প্রবল বিরুদ্ধ শক্তি নিজের কোন অনিষ্টাচরণ করে, এই ভয়ে আত্মরক্ষার্থ কপটাচারের আশ্রয় লয়। প্রবলের পীড়নেই দুর্ব্বল হৃদয়ে এই সমস্ত দোষের উৎপত্তি হয়, তাই এই সকল দোষ ক্রীতদাস ও অত্যাচারপীড়িত মানবগণের মধ্যে সমধিক পরিলক্ষিত হয়।

নিকৃষ্ট ব্যক্তি আত্ম-সামর্থ্যের মিথ্যা গর্ব্ব করিয়া শ্রেষ্ঠের সমান হইতে চেষ্টা করে। এরূপ ব্যক্তি বাস্তবিক যে সব গুণ তাহার নাই, সে সব গুণ আপনাতে আরোপ করিয়া তাহার স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। এই দোষ, নম্রতা ও শিক্ষনীয়তা গুণের বিপরীত। এদোষ থাকিলে, জনক জননী ও সন্তানের মধ্যে এবং গুরু শিষ্যের মধ্যে পরস্পরানুকূল সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া উঠে। ভালবাসা হইতে যে মধুর ভাবের উদয় হয়, উপরি-লিখিত বিদ্বেষ-প্রসূত দোষসকল তাহাকে বিনষ্ট করে। উহাদের দ্বারা সংসারের সুখ ও শান্তি নাশ হয় এবং বিশেষ বর্দ্ধিত হইলে, তাহারা দেশের সম্পদ্ ও ধর্ম্মের প্রভাব বিনষ্ট করে।

ভগবান মনু শ্রেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারাংশ এইঃ—

"বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মাদ্ধিতং চোপদিশৎস্বপি ॥
শ্রেয়ঃ সু গুরুবদ্ বৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ।"

(মনু ২)

বিদ্যাশিক্ষা দেন তোমা যেই গুরুগণ।
জন্মেছেন তব বংশে যে যে মহাজন ॥
যাঁহারা করেন রক্ষা অধর্ম্ম হইতে।
হিত উপদেশ যাঁরা করেন তোমাতে ॥
তাঁ সবারে গুরুসম করিবে ব্যবহার।
নিত্য শ্রদ্ধা সনে তুষ্টি সাধিবে সবার ॥

পূর্ব্বোক্ত সদ্গুণসমূহের পোষণ ও দোষগুলির পরিবর্জ্জন সম্বন্ধে একটী বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। পিতা মাতা প্রারব্ধ কর্ম্ম-বশে লব্ধ হইয়া থাকেন, কিন্তু গুরু সম্পূর্ণরূপ প্রারব্ধাধীন নহেন। গুরু অনেকটা বর্ত্তমানে নির্ব্বাচনসাপেক্ষ। সুতরাং পিতা মাতা সম্পূর্ণ আদর্শ পিতা মাতা না হইলেও যেমন দ্বিধাশূন্য হইয়া তাঁহাদের প্রতি ভক্তি

বিশ্বাস ও বশ্যতাসহকারে আচরণ করা কর্ত্তব্য, শিক্ষক সম্বন্ধে ঠিক ততদূর নহে। যতদিন না নিজের বিচার-শক্তি পরিপক্ক হয়, ততকাল পর্য্যন্ত পিতা মাতাই আমাদের জন্য শিক্ষক নির্ব্বাচন করেন; সুতরাং তাঁহার (আমাদের উপর) ক্ষমতা পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত। এরূপ গুরুর ব্যবহার সম্বন্ধে যদি মনে কোন দ্বিধা জন্মে, তবে তাহা পিতামাতার গোচরে আনিয়া তাঁহাদের আদেশমত কার্য্য করা কর্ত্তব্য। কিন্তু গুরু যেখানে স্ব-নির্ব্বাচিত, সেখানে তাঁহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে, শিষ্যের সে বিষয় ধীরভাবে বিচার করিয়া কার্য্য করা উচিত। এরূপস্থলে শিষ্যের উচিত এই যে, বিশেষ সম্ভ্রম ও বিনয় সহকারে অথচ সুস্পষ্টভাবে তাহার সন্দেহ আচার্য্যকে নিবেদন করিয়া তাহার নিরাকরণের জন্য প্রার্থনা করা এবং আচার্য্যেরও কর্ত্তব্য যে, হয় সেই সন্দেহের অমূলকত্ব প্রদর্শন করা অথবা তাহার প্রতিবিধান করা।

বর্ত্তমান কালে জগতে ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপাত্রে বিশ্বাস নিতান্ত সুলভ বলিয়া শিক্ষার্থীদিগকে উপরোক্তভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে পুরাকাল হইতে গুরুভক্তি অত্যন্ত প্রবল থাকায় অনেক লোকে, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া, অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক অবশেষে অনুতাপভাগী হন। কিন্তু প্রাচীন কালে জনসমাজে যেরূপ আদর্শ গুরু সকল ছিলেন, এক্ষণে আর সেরূপ নাই। তাই এখন আচার্য্য নির্ব্বাচনের একটু বিশেষ বিচারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে সর্ব্বদা গুরুলোকের ন্যায় সম্মান করা কর্ত্তব্য এবিষয়ে মনুসংহিতায় এইরূপ উপদেশ আছেঃ—

"শয্যাসনেঽধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ ॥
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ ॥

উৰ্দ্ধং প্রাণাহ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবিরঃ আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদভ্যাং পুনস্তান্প্রতিপদ্যতে ।।
অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ ।
চত্বারি তস্য বৰ্দ্ধন্তে আয়ুঃ প্রজ্ঞা যশো বলং ॥

(মনু ২।১১৯)

শ্রেষ্ঠের সহিত ভাই এক শয্যাসনে ।
বসিবে না কদাচন শ্রেয়ঃ কামী জনে ।
শয়ন আসনে যবে আছে কোন জন ।
হেন কালে যদি হয় গুরু আগমন ॥
অবিলম্বে শয্যাসন করি পরিহার ।
ভক্তিভাবে প্রত্যুদ্গম করিবে তাঁহার ॥
বয়োজ্যেষ্ঠ যেই কালে করে আগমন ।
যুবা প্রাণ-বায়ু করে উৰ্দ্ধে উৎক্রমন ॥
প্রত্যুত্থান আর অভিবাদনের পর ।
স্বস্থ হয় পুনঃ বায়ু, জেনো স্থিরতর ॥
অভিবাদনেতে যেই সতত তৎপর ।
বৃদ্ধ সেবা যেই জন করে নিরন্তর ॥
আয়ুঃ প্রজ্ঞা যশ আর দেহ মন বল ।
এই চারি হয় তার নিশ্চয় প্রবল ॥

পুনশ্চঃ—

অভিবাদয়েৎ বৃদ্ধাংশ্চদদ্যাচ্চৈবাসনং স্বকং ।
কৃতাঞ্জলিরুপাসীত গচ্ছতঃ পৃষ্ঠতোঽন্বিয়াৎ ॥

(মনু ৪।১৫৪)

বৃদ্ধজন যবে করিবেন আগমন ।
অবধান করি তাঁয় দিবে নিজাসন ॥
পরে কৃতাঞ্জলি হয়ে সম্মুখে বসিবে ।
গমন সময়ে তাঁর পিছে পিছে যাবে ॥

বয়োবৃদ্ধের প্রতি একপ্রকার সম্মান প্রদর্শন যুবা ও প্রৌঢ়ের পক্ষে অতি শিষ্টাচারসঙ্গত এবং যিনি এরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করেন, তিনি সকলের প্রিয় হন। এই শিষ্টাচারটী স্বভাবতঃ বিনয় ও নম্রতাসাপেক্ষ।

উদ্ধৃত মনুর বচনটীতে—"চত্বারি তস্য বর্দ্ধন্ত আয়ু প্রজ্ঞা যশোবলং"—যে উক্ত হইয়াছে যে বৃদ্ধের প্রতি অভিবাদনাদি যুবার স্বাস্থ্যের ও উপকারক, এ কথাটী যেন কেহ উপেক্ষা না করেন। চতুর্দ্দিকে শক্তির সমতা বিধান চেষ্টা নৈসর্গের অন্যতম নিয়ম। একটা শীতল পদার্থ একটী উত্তপ্ত পদার্থের সন্নিকটস্থ হইলে, উষ্ণ দ্রব্যটী হইতে তাপ শীতল দ্রব্যটীতে সংক্রামিত হইয়া ক্রমে উভয়েই সমতাপ বিশিষ্ট হয়। এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই সবলের জীবনীশক্তি দুর্ব্বলে সংক্রামিত হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা দ্বারাও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, রোগী সন্নিহিত সুস্থ ব্যক্তির জীবনী-শক্তি আকর্ষণ করে এবং দুর্ব্বলব্যক্তি সবলের শক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই নৈসর্গিক নিয়মবশে জৈব-চৌম্বক্য শক্তি প্রয়োগ cures by human-magnetism দ্বারা অনেকানেক ব্যাধি আরোগ্য করা হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। এইজন্য যুবকগণের প্রাণশক্তি উক্ত নৈসর্গিক বিধিবশে তাঁহাদের অভিমুখ্য হয়। তাই, যুবাগণ প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা বৃদ্ধগণের মনে হিতৈষণা বৃদ্ধি করিয়া—তাঁহাদিগকে গ্রহণোন্মুখিতার পরিবর্ত্তে প্রদানোন্মুখী করিয়া—তাঁহাদের আশীর্ব্বাদের সহিত প্রাণশক্তি প্রত্যাগত করে।

সম্মান, বিনয়, সত্যাচার, সেবাপরায়ণতা এবং ভয়-সন্দেহ আত্মশ্লাঘাদির পরিহার, শ্রেষ্ঠের প্রতি শিষ্টাচার প্রভৃতি সদ্গুণশালী যুবক সকলেরই প্রিয় এবং নিরন্তর গুরুজনের সান্নিধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক নানাপ্রকারে আত্মোন্নতি সাধনে সক্ষম হয়। গুরুলোকেরাও এরূপ যুবকের সর্ব্বদা সমাদর করেন ও নানা মতে তাহাকে সাহায্য করিয়া আনন্দ লাভ করেন।

অন্যান্য গুরুজন সম্বন্ধে যে যে দোষের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, বয়োজ্যেষ্ঠগণের সহিত আচরণে ও সেগুলির বিকাশ সম্ভব। তদ্ব্যতীত বৃদ্ধজন সম্বন্ধে অসম্মান ও আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি দোষের আবির্ভাব হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। কারণ যুবকগণের শারীরিক শক্তি স্বভাবতঃ বৃদ্ধের অপেক্ষা অধিক; এই বলাধিক্য সহজেই অনুভূত হয়; কিন্তু বৃদ্ধের (যুবাপেক্ষা) জ্ঞানাধিক্য বাহ্যদৃষ্টিগম্য নহে। বৃদ্ধগণের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে যুবকগণের আর একটী দোষ অসহিষ্ণুতা। তাহাদের যৌবনসুলভ চাঞ্চল্য ও ক্ষিপ্রকারিতা বৃদ্ধ ব্যক্তির ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যের জন্য স্বভাবতঃ বিসদৃশ বোধ হয়।

এই অধ্যায়ে যে সকল সদ্গুণের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহাদের অনুশীলন ও অভ্যাস বর্ত্তমান কালে সমধিক প্রয়োজনীয়; কারণ আত্মাদর ও আত্মপ্রতিষ্ঠা অধুনাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সভ্যতার নিত্য সহচর এবং গুরু লঘুর পার্থক্য বুদ্ধি তাহাতে সহজে স্থান পায় না।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের রহস্য ভ্রান্তভাবে গ্রহণ করাতে, এক্ষণে ধর্ম্ম-ভাবের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে এবং তৎসহ ভগবদ্ভক্তি ও আস্তিকতা মানসিক দৌর্ব্বল্য ও অন্ধবিশ্বাসের চিহ্ন বলিয়া উপহসিত হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্মভাব ও তৎসংক্রান্ত সদ্গুণাবলী প্রকৃত তেজস্বিতা ও মনুষ্যত্বের ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ। ইতিহাস পুরণাদির আদর্শ বীরচরিত্রসমূহেই ঐ সকল মহাগুণ পরিলক্ষিত হয়; নীচাশয় ও ভ্রষ্টাচারী মনুষ্যে তাহাদের বিকাশ দৃষ্ট হয় না।

(ধর্ম্মগ্লানি অপেক্ষা) প্রকৃত রাজভক্তিও দেশ-হিতৈষণার আরও অধিক গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ধীরভাবে ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলাই ঐ গ্লানির কারণ। বলা বাহুল্য যে, রাজা প্রজা উভয়েরই পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে

ক্রটীবশতই বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। মানব সমাজের শৈশবাবস্থায় দৈবরাজবংশাবলীর উপর পৃথিবী শাসনের ভার ন্যস্ত ছিল, সুতরাং তদানীন্তন শাসনপ্রণালীও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল এবং রাজাগণ ও আদর্শ নরপতি ছিলেন। যখন স্বার্থত্যাগী ও প্রজাহিতৈকব্রত রাজা অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন, তখন যে প্রজাপুঞ্জের রাজভক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাহার পর, মানবজাতির কিশোরাবস্থা অতিক্রান্ত হইলে, তাহাদের স্বাবলম্বন শিক্ষার সময় উপস্থিত দেখিয়া সেই দৈব রাজবংশাবলীকে জগত হইতে প্রত্যাহরণ withdarwn করা হইয়াছিল। স্নেহময়ী মাতা যেমন শিশুসন্তানকে প্রথমে অঙ্গুলি ধরিয়া দাঁড়াইতে ও হাঁটিতে শিক্ষা দেন, পরে একটু অভ্যাস হইলে যাহাতে শিশু নিজে; বিনা সাহায্যে হাঁটিতে পারে তদুদ্দেশে জননী তাহার অঙ্গুলি ছাড়িয়া দেন, সেইরূপ মানবজাতির শৈশবাবস্থায় (পূর্ব্বকল্পের) সিদ্ধ রাজর্ষিরা রাজ্যসাশন ও প্রজা পালন শিক্ষা দিতে এবং দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিরা বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি শিক্ষা দিতে মানব বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে সেই শিক্ষা মানবজাতির কিয়ৎপরিমাণে অভ্যস্ত হইলে, যাহাতে তাহারা নিজে নিজে রাজাশাসন, প্রজাপালন, সমাজশাসন প্রভৃতি করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য ঐ রাজর্ষি দেবর্ষিগণকে প্রত্যাহরণ করা হয়। আবার শিশু যেমন মাতার অঙ্গুলি ছাড়িয়া দাঁড়াইতে বা চলিতে চেষ্টা করিলে প্রথমে অনেক পদস্খলন ও আঘাত সহ্য করিয়া তবে অন্য অবলম্বন বিনা চলিতে সমর্থ হয়, মানবজাতিও তদ্রূপ সেই আদর্শ নরপতি ও আচার্য্য বিরহিত হইয়া অনেকানেক নিষ্ফল চেষ্টা ও আঘাত সহ্য করিয়া অবশেষে স্বয়ং রাজ্যশাসন ও সমাজশাসনে পারদর্শী হইবে। এক্ষণে জনসাধারণের

মধ্যে (অগভীর) বিদ্যার বিস্তার ও (রাজশক্তির সহিত বহু ঘাত প্রতি-ঘাতের পর) সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর উদ্ভববশতঃ এবং রাজশক্তি বিজ্ঞ, বহুদর্শী নেতার অভাবে প্রজামণ্ডলীর অধিকাংশের মতাধীন হওয়াতে প্রকৃত রাজধর্ম্ম ও রাজার যথার্থ স্বত্ব ও আধিপত্য লোক-চক্ষের অন্তরালে পড়িয়াছে। মন্ত্রণাবহুল শাসনপ্রণালীর অঙ্গবাহুল্যে—নানাবিধ সচিব সমিতি, প্রজাসমিতি, সাধারণসভা প্রতিনিধিসভা প্রভৃতি—শাসনকর্ত্তা সম্রাটের কথা একপ্রকার চাপা পড়িয়া গিয়াছে। এইরূপে নানাপ্রকার শাসনপ্রণালীর পরীক্ষা করিতে গিয়া অনভিজ্ঞতা ও স্বার্থপরতাবেশে দারিদ্র্য, বণিক-শ্রমজীবি বিবাদ কৃষিশিল্পের অবনতি প্রভৃতি নানাবিধ সমাজ-বিপ্লব উৎপন্ন হইয়াছে। রাজা ও সচিব, প্রজা ও প্রতিনিধিসভা প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে স্ব স্ব কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উদ্রেক ভিন্ন ইহার অন্য প্রতিকার নাই। বস্তুতঃ রাজ্যশাসন ও সমাজবন্ধনের প্রাচীন আদর্শকে বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান ও সভ্যতার উপযোগী করিয়া পুনঃ প্রবর্ত্তন ভিন্ন জগতের এই সমাজ-বিপ্লবের দ্বিতীয় প্রতিকার নাই। আর্য্য-সন্তানগণ আবার প্রাচীন আর্য্য আদর্শে শিক্ষিত এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট গুণগ্রামে ভূষিত হইয়া রাজ্যাধিবাসীর (Gentlemanliness) কর্ত্তব্যের ও শিষ্টাচারের (Citizen) অর্থাৎ ঈশ্বরভক্তি, রাজভক্তি ও আদর্শ দেশ-হিতৈষণার আদর্শ জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধন জন্য আপাততঃ প্রত্যেক পরিবারে পূর্ব্বোক্ত আর্য্যোচিত গুণগ্রামের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। পরিবারের মধ্যে পিতা মাতাই পরম গুরু। কিন্তু তাঁহাদেরই সম্বন্ধে সম্মান, ভক্তি, বশ্যতা ও সেবাপরায়ণতার অভাব আধুনিক হিন্দু সমাজে সমধিক পরি-লক্ষিত হইতেছে। প্রত্যেক হিন্দু যুবকেরই কর্ত্তব্য যে, এ সম্বন্ধে অবিলম্বে

[পূর্ব্বাদর্শ অনুকরণে প্রবৃত্ত হন এবং আদর্শ সন্তানরূপে গৃহশোভা বর্দ্ধন করেন। পিতামাতার সর্ব্ব প্রকার অভাব পূরণে ব্যগ্রতা, তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালনে আনন্দ ও আগ্রহাতিশয়, তাঁহাদের বিচারে ও সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং তাঁহারা যে সর্ব্বতোভাবে আমাদের হিতকাঙ্ক্ষী এই দৃঢ় বিশ্বাস—ইত্যাদি সদ্‌গুণ সকল গৃহে সাধন করিলে, ভবিষ্যতে সমাজ হিতৈষণা ও দেশহিতৈষণাব প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হইবে।

আচার্য্য সম্বন্ধেও শাস্ত্রবিহিত আচরণ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যদিও বর্ত্তমান কালে শিক্ষক ও ছাত্র মধ্যে পূর্ব্ববৎ স্নেহময় ও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই, তত্রাপি শাস্ত্রানুরূপ আচরণ পুনরভ্যাস করিলে আবার তদ্রূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

বৃদ্ধগণের প্রতিও পূর্ব্ববৎ সম্মান ও শিষ্টাচার করিবে। সকল বৃদ্ধ পুরুষকে পিতৃবৎ এবং সকল বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা ও সেবা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

আর্য্য সন্তানগণ অধ্যবসায় সহকারে উপরিলিখিত সদ্‌গুণ সকল অনুশীলন ও সাধন করুন। ভগবদনুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া যদি তাঁহারা একান্তমনে এই সাধনা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ সকল গুণ স্ব স্ব চরিত্রগত করিয়া বংশের, জন্মভূমির এবং জগতের কল্যাণ সাধন ও মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে, আর্য্যনীতি হইতে যদি তাঁহারা বিন্দুমাত্রও স্খলিত হন, তাহা হইলে জগতে তাঁহারা "অনার্য্য" বলিয়া তিরস্কৃত হইবেন। আর্য্যবংশধরের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর তিরস্কার আর কিছুই হইতে পারে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সধর্ম্মত্যাগোদ্যত অর্জ্জুনের প্রতি "অনার্য্য" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। (গীতা ২।২ দেখ)।

নবম অধ্যায়।

তুল্যব্যক্তির প্রতি ব্যবহার।

এক পরিবারস্থ এবং এক সমাজস্থ তুল্যব্যক্তিগণের পরস্পরের প্রতি রাগ ও দ্বেষবশতঃ যে সমস্ত শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হয়, আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনা করিব। অনুরাগ জীবগণকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে, এবং বিরাগ পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়—ইহাই সনাতন বিধি। পতি পত্নি, ভ্রাতা ভগ্নি, কুটুম্ব বন্ধু এবং সমাজের সমাবস্থা (পরিচিত কি অপরিচিত) লোকসকলের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দ্বারা যে সমস্ত হৃদয়াবেগের উৎপত্তি হয়, তাহারা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া গুণ বা দোষে পরিণত হয়। কি গৃহে, কি সমাজে ঐ সকল দোষ গুণের ক্রিয়া নিরন্তর চলিতেছে।

পরিবারস্থ সমপর্য্যায়ের ব্যক্তিসমূহের মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণ আচরিত হয়, তদ্বারা ঐ সকল জীবাত্মা ক্রমশঃ আপনাদের মধ্যে একত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় এবং এইরূপে তাহারা সর্ব্বজীবের একাত্মতা উপলব্ধির পথে অগ্রসর হয়। ইহাদের প্রত্যেকে পরিবার মধ্যে এমন কতকগুলি জীবাত্মাদ্বারা পরিবেষ্টিত যাঁহাদিগের অবস্থা, স্বার্থ, আশা ও আশঙ্কা তাঁহার সহিত প্রায় সমতুল্য এবং যাঁহাদিগের সহিত তিনি সমসূত্রে এরূপ ভাবে আবদ্ধ যে, একের অভ্যুদয়ে বা পতনে অপরের অভ্যুদয় বা পতন হয়, একের সুখে বা দুঃখে অপরের সুখ বা দুঃখ হয়, একের জয় বা পরাজয়ে অপরের জয় বা পরাজয় হয়—অর্থাৎ একের

ইষ্টানিষ্টে অপরের ইষ্টানিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। এতদ্বারা তাঁহার এই দৃঢ় জ্ঞান হয় যে, পরিবারভুক্ত সকলের সহিত সদাচরণ করিলেই সুখলাভ হয় এবং কদাচরণ করিলেই দুঃখভোগ করিতে হয়। এইরূপে ক্রমশঃ তিনি শিক্ষা করেন যে, পূর্ণমাত্রায় আনন্দ উপভোগের ইচ্ছা করিলে, অর্থাৎ সকলের সুখের আশা করিতে গেলে, সকল মনুষ্যের প্রতিই একপরিবারভুক্ত ব্যক্তির ন্যায় অর্থাৎ ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিতে হয় এবং এই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের অভাবই মানবজাতির সর্ব্ববিধ দুঃখ, কষ্টের মূল।

তুল্য ব্যক্তির প্রতি ভালবাসাকে প্রীতি বা সখ্যতা কহে। সদয়তাই তাহার পরিচায়ক ; চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে এই—সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ব-বিষয়ে সদয়তা দ্বারাই তাহা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সমাবস্থ ব্যক্তি সম্বন্ধে মনে, বাক্যে বা কার্য্যে বিন্দুমাত্রও রূঢ়তা থাকিলে, প্রকৃত প্রীতি বা সখ্যতা জন্মিতে পারে না। বস্তুতঃ বাক্য ও কার্য্য, চিন্তার অনুগামী বলিয়া সর্ব্বপ্রকার চিন্তাতে কর্কশতা বা অস্নেহ পরিহার করিলেই বাক্যে বা কার্য্যে আর প্রমাদ ঘটিবে না। বাক্-সংযমের অত্যা-বশ্যকতা সম্বন্ধে ভগবান মনুর উপদেশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মধুর ও বিনীত বাক্য কেবল পরিজনবর্গের প্রতি নহে, জগতের সকলের প্রতি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

"যস্য বাঙ্মনসো শুদ্ধে সম্যগ্‌গুপ্তে চ সর্ব্বদা।
স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলং॥
নারুন্তুদ স্যাদার্ত্তোঽপি ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ।
যয়াস্যোদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েৎ॥"

(মনু—২।১৬১।)

বাক্য মন শুদ্ধ গুপ্ত সম্যক্ যাঁহার।
বেদান্তোক্ত সর্ব্ব ফল হইবে তাঁহার॥

আর্ত্ত হয়েও মর্ম্মপীড়া নাহি দিও কা'রে।
পরদ্রোহে মন যেন কভু নাহি ফিরে॥
পরের উদ্বেগকর যে সব বচন।
ভুলেও কখন নাহি কর উচ্চারণ॥

এই নিষেধাজ্ঞা যদিও নিকৃষ্টের প্রতি শ্রেষ্ঠের ব্যবহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তথাচ ইহা উচ্চাব্য সকলের সহিত শিষ্টাচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রযুজ্য। বিশেষতঃ পরিজনবর্গমধ্যে পরস্পরের দোষ পরস্পরের অবগত থাকায়, রসনা সহজেই অসংযত হইয়া পড়ে বলিয়া, তৎসম্বন্ধে উক্ত নিষেধাজ্ঞা সমধিক পরিপালনীয়। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটীতে পরিজনবর্গের পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার সঙ্ক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে:—

"ন পাণিপাদ চপলো ন নেত্র চপলোঽনৃজুঃ।
ন স্যাদ্বাকচপলশ্চৈব ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ॥

*   *   *   *

ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যৈর্মাতুলাতিথি সংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতি সম্বন্ধি-বান্ধবৈঃ॥
মাতাপিতৃভ্যাং যামীভির্ভ্রাত্রা পুত্রেন ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেন বিবাদং ন সমাচরেৎ॥"

(মনু, ৬)

হস্ত, পদ, চক্ষের ত্যজিবে চপলতা।
বাক্‌চাপল্য পরদ্রোহ তেয়াগিবে তথা॥
সর্ব্বরূপ কুটিলতা দিবে বিসর্জ্জন।
যদ্যপি করিবে সুখী সব পরিজন॥

*   *   *   *

পুরোহিত, ঋত্বিক্ আর আচার্য্য মাতুল।
অতিথি, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক, অতুর॥

জাতি, বৈদ্য, সম্বন্ধি, বান্ধবগণ আর।
মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, স্বামি, সে সবার॥
ভার্য্যা, কন্যা, আর নিজ দাসগণ সনে।
প্রবৃত্ত না হবে কভু কলহাচরণে॥

অনন্তর ভগবান্ মনু ব্রহ্মাণ্ডান্তঃর্গত বিভিন্ন লোকসমূহের সহিত মানবসমাজভুক্ত বিভিন্ন স্তরের সাদৃশ্য ও সংস্রব ধরিয়া উল্লিখিত আত্মীয় বন্ধুগণ যে যে লোকের সহিত সম্বন্ধ তাহার ব্যাখ্যান পূর্ব্বক উপদেশ দিয়াছেন যে, ইহলোকে তাঁহাদের সহিত শান্তি ও প্রীতি সংস্থাপন করিলে, তৎসংক্রান্ত ব্রহ্মাণ্ডলোকের সহিত শান্তিস্থাপন করা হয়। উপসংহারে আবার বলিয়াছেন :—

ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ॥
ছায়া স্বা দাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরং।
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা॥

জ্যেষ্ঠ সহোদরে দেখ সমান পিতার।
পত্নী তনয়েরে ভাব তনু আপনার।
দাসগণে ছায়াসম করিবেক জ্ঞান।
দুহিতা কৃপার পাত্রী কভু নহে আন॥
এরা যদি করে কেহ মন্দ ব্যবহার।
বিচলিত নাহি হবে কহিলাম সার॥

পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র ও ভ্রাতৃবর্গের পরস্পরের মধ্যে শিষ্টাচারের আদর্শ রামায়ণে সুন্দররূপে চিত্রিত আছে। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা পতি-পত্নীর উজ্জ্বলতম আদর্শ; চারি পুত্র ও মহারাজ দশরথ পিতা-পুত্রের অনুপম সুন্দর দৃষ্টান্ত; শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন সৌভ্রাত্রের অনুপম

চিত্র। শিক্ষার্থীগণের এই সকল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তদনুসারে স্ব স্ব জীবন পরিচালিত করা উচিত।

পতিব্রতা স্ত্রীসম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তিকশ্চন॥
উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষ্যং স্ত্রীনির্বাহ্মনং॥
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহ॥
পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥

(মনু, ১১।২৬।)

শ্রী আর স্ত্রী দুয়ে ভেদ কিছু নাই।
লক্ষ্মীরূপা নারী তারে পুজিবে সদাই॥
গৃহের আলোক, শোভা, মঙ্গল আধার।
সন্তান জননীরূপে পুজিতা সবার॥
সন্তান জঠরে ধরে, করয়ে পালন।
আনন্দে জীবন-যাত্রা নারীর কারণ॥
অপত্য ও ধর্ম্মকর্ম্ম অনুপম রাগ।
শুশ্রূষণ, দারাধীন জেনো মহাভাগ॥
পিতৃগণ আর নিজে দারার কৃপায়।
স্বর্গবাসী হয়ে সদা জল-পিণ্ড পায়॥
দেহ, মন, বাক্য সদা করি সংযমন।
পতিপ্রতিকূল কভু না করে গমন॥
সাধ্বী গৃহলক্ষ্মী সেই শাস্ত্রের লিখন।
ভর্তৃলোক পান তিনি নাহিক খণ্ডন॥

পুনশ্চ :—

"এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রহুস্তথা চৈতৎ যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা ॥"

(মনু ৯।৪৫)

নিজে জায়া আর তাঁর প্রজা সমুদায়।
সকলে মিলিত হয়ে পুরুষ নিশ্চয় ॥
সমস্বরে তাই বলেছেন বিপ্রগণ।
যেই জায়া সেই ভর্ত্তা করহ শ্রবণ ॥

এই ভাবটী কেমন মধুর! সমস্ত পরিবার এক—একই প্রাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইহাই পারিবারিক ধর্ম্মের মূলভিত্তি। এই জন্যই আর্য্য-সমাজে বিবাহবন্ধন অচ্ছেদ্য। পিতা, মাতা, সন্তান সকলে মিলিয়া এক গৃহস্থ পদবাচ্য; প্রত্যেকেই অপর সকলকে আত্মনির্ব্বিশেষে ভালবাসেন; একজন যাহাতে সুখী, সকলেই তাহাতে সুখী; একের আনন্দে সকলের আনন্দ, এবং একের দুঃখে সকলে দুঃখিত। জীবাত্মা যেমন নিজদেহের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথাযথ রক্ষা ও পুষ্টিসাধন জন্য নিয়ত যত্ন করে, গৃহস্থ তদ্রূপ নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্ব্বিশেষে দারা পুত্র পরিজনবর্গের রক্ষা ও পালন করিবেন। একটি পরিবার একটি ক্ষুদ্রজগৎ; সকল সদ্‌গুণই একপরিবার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে; সর্ব্বপ্রকার গুরুজনের প্রতি ব্যবহার পিতামাতা সম্বন্ধে আচরিত হইতে পারে; বালক বালিকারা আপনাদের মধ্যে ব্যবহার দ্বারা, সর্ব্বপ্রকার তুল্য ব্যক্তির প্রতি বিধেয় আচরণ শিক্ষা করিবে এবং পিতামাতার বালক বালিকাদের সম্বন্ধে ব্যবহার হইতে সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি বিধেয় আচরণ শিক্ষা করিতে পারিবে। যুবকগণ গৃহে পরিজনবর্গের মধ্যে সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণ সাধনা করিলে, ভবিষ্যতে তাঁহারা ঐ সকল সদ্‌গুণ জগতের সকল কার্য্যে

প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেন এবং সমাজের ও দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবেন। ভবিষ্যৎ জীবনে আচরণীয় সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণই স্ব স্ব গৃহে অভ্যাস করিতে পারেন।

ভ্রাতা ও ভগিনীগণের মধ্যে আন্তরিক স্নেহ পরিবারিক ঐশ্বর্য্যের মূল। পাণ্ডবগণের ইতিহাসে আমরা ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। কেবল অকপট সৌভাত্র বলেই তাঁহারা অশেষবিধ দুঃখ ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শিষ্টাচার ও পরমনস্তাপ পরাঙ্মুখতা (Consideration for the feelings of others) শীলতার প্রধান অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। তজ্জন্য মর্য্যাদা ও শিষ্টতা (Good manners) চিরকালই আর্য্যাদিজাত্যের বিশেষত্ব বলিয়া আদৃত হইয়া আসিতেছে। বিনয় চিরদিনই আভিজাত্যের সহচর। অতএব সর্ব্বদা সত্য অথচ প্রিয়বাক্য বলা কর্ত্তব্য।

মনু বলিয়াছেন ঃ—

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্ম সনাতনঃ ॥"

(মনু ২।১৩৮)

সত্য এবং প্রিয়বাক্য বলিবে সতত।
যে সত্য অপ্রিয় তাহে হইবে বিরত ॥
অনৃত, হলেও প্রিয়, কভু না বলিবে।
সনাতন ধর্ম্ম এই নিশ্চয় জানিবে ॥

অবশ্য সংসারে অনেক সময়ে অপ্রিয় সত্য বলা আবশ্যক হয়— এমন কি তাহা না বলিলে কর্ত্তব্যহানি হয়। অধীন ব্যক্তির দোষ সংশোধন জন্য তাহার দোষ প্রদান ও তিরস্কারের প্রয়োজন হয়। এরূপ

অবস্থায় অপ্রিয় সত্য বলা অপরিহার্য্য হইলেও, তাহা যাহাতে রূঢ় বা কঠোর না হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হইবে এবং যতদূর সম্ভব মৃদুতা ও নম্রতার সহিত দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিবে। রূঢ় বা কর্কশ বাক্য তিরস্কারের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দেয়, কারণ তিরস্কৃতের হৃদয়ে তাহা সহজে প্রবেশ লাভ কয়ে না।

বর্ত্তমান সময়ে শিষ্টাচারের আর পূর্ব্ববৎ আদর নাই বলিলেই হয়। অথচ এই শীলতার অনাদর হইতে যথেষ্ট কুফল ফলিতেছে। কোমল হৃদয় ও বিনীত স্বভাব হইতেই শিষ্টাচারের উৎপত্তি হয় এবং ইহা চরিত্রের উন্নতি ও মাধূর্য্যের পরিচায়ক। আত্মসংযম ও আত্মমর্য্যাদা বোধ না থাকিলে শিষ্টতা (Good manners) সম্ভবে না। এবং অনেক সমাজিক ব্যাপার, যাহা অশিষ্ট লোকের মধ্যে কলহের হেতু হইয়া উঠে, শিষ্টাচারী ব্যক্তি ঐ সকলগুণের সাহায্যে তাহা অতিক্রম করিয়া থাকেন। সাদর সম্ভাষণ, মধুর বাক্য, মিষ্টহাস্য, গম্ভীর মূর্ত্তি দ্বারা সামাজিক সদালাপ মধুরতর ও আনন্দজনক হয় এবং প্রত্যেক হিন্দু যুবকের সযত্নে পূর্ব্বাদর্শ অনুসারে এই সকল শিষ্টাচার অভ্যাস করা একান্ত কর্ত্তব্য। সুবর্ণ ও বিশোধনে উজ্জ্বলতর হয় এবং উন্নত চরিত্র ও শিষ্টাচার ভূষিত হইয়া সমধিক হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে।

আতিথ্য একটী মহৎগুণ এবং আর্য্যগুণের নিকট অতিথি দেবতার ন্যায় পূজ্য। মনু বলিয়াছেন ঃ

> "সংপ্রাপ্তায় ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।
> অন্নং চৈব যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকং ॥
> তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌চতুর্থী চ সুনৃতা।
> এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।

অপ্রণোদ্যোঽতিথিঃ সায়ং সূর্য্যোঢো গৃহমেধিনা।
কালে প্রাপ্তস্ত্বকালে বা নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ॥
ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ।
ধন্যং যশস্য মায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চাতিথি ভোজনং॥"

(মনু ৩।৯৯)

ভাগ্যযোগে অতিথির হলে আগমন।
আসন, উদক দিবে করিয়া যতন॥
পরে যথাবিধি তাঁর করিয়া সৎকার।
দিবে অন্ন আদরেতে শক্তি যে প্রকার॥
তৃণ, ভূমি, জল, প্রিয় শুভবাক্য আর।
সতের গৃহেতে নাহি অভাব ইহার॥
সন্ধ্যাকালে সূর্য্য যেই অতিথি পাঠান।
তারে দূর না করে গৃহস্থ মতিমান॥
আসিলে অতিথি গৃহে কালে বা অকালে।
অনশনে তারে না রাখিবে কোন কালে॥
অতিথিরে যে দ্রব্য না করিবে অর্পণ।
গৃহস্থ সে দ্রব্য যেন না করে ভোজন॥
অতিথির সুভোজনে গৃহীর নিশ্চয়।
ধন যশ আয়ুবৃদ্ধি স্বর্গলাভ হয়॥

পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান কালে বহুসংখ্যক রাস্তা ঘাট, পোল, রেলপথ প্রভৃতি নির্ম্মান দ্বারা দেশ ভ্রমণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তত্রাপি যে পুরাকালে এতদ্দেশে বর্ত্তমানের তুল্যই দেশভ্রমণ প্রচলিত ছিল; তাহার প্রধান কারণ এই যে, অতিথি সৎকার ধর্ম্মের একটী শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া সর্ব্বত্র সমাচরিত হইত। বর্ত্তমানের ন্যায় তখনও নিত্য নিত্য শত সহস্র ধারায় যাত্রীসকল তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে, দেশ হইতে

দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে, নিত্য নূতন দেশের, নূতন সমাজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহপূর্ব্বক হৃদয়ের ও আমিত্বের প্রসার সাধন করিতেন। নানা সমাজের রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, নানা সম্প্রদায়ের লোকের সহিত হৃদয়ের বিনিময় করিয়া, নানা স্থানের হস্তলিখিত নূতন নূতন গ্রন্থ সংগ্রহ ও পাঠ করিয়া, স্ব স্ব দেশের ও সমাজের বিবিধ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তার সম্পাদন করিতেন এবং দূরস্থিত সমাজে বন্ধুতার সঙ্ঘটন করিয়া এই বিস্তৃত মহাদেশব্যাপী আর্য্যজাতির বিভিন্ন সমাজকে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক মহাপরিবারভুক্ত করিয়া রাখিতেন। যদি তৎকালে আতিথ্যধর্ম্ম সর্ব্বসমাজে একান্ত আদৃত না থাকিত, যদি গৃহিগণ সর্ব্বত্র অতিথি সৎকারে মুক্তহস্ত না থাকিতেন, এবং যদি পুণ্যবান রাজা, বণিক ও অন্যান্য দাতাগণ পথিকগণের সুবিধার জন্য চতুর্দ্দিকে কুপ, তড়াগ, পান্থশালা, ধর্ম্মশালা, ও সদাব্রত প্রতিষ্ঠিত না করিতেন, তাহা হইলে কি উক্তপ্রকার দেশপর্য্যটনের ও তীর্থ ভ্রমণের সম্ভব হইত? হায়! কবে আবার আর্য্যসন্তানগণ বুঝিতে পারিবেন "সর্ব্ব দেবময়োঽতিথি," কবে আবার গোপনে নিষ্কাম দানের মহত্ত্ব তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন!

সততা, ন্যায়াচরণ, বিশ্বাস, মর্য্যাদা, ঋজুতা, ভদ্রতা, বিশ্বাসরক্ষা, সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা প্রভৃতি গুণসকল সমাজের সুখ ও অভ্যুদয়ের নিদান। যে সমাজে এই সকল গুণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়, সে সমাজের সুখ ও সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এই সমস্ত গুণে ভূষিত হইলে মনুষ্য যে সুখী ও দেশহিতৈষী হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

সংসারে একত্র বাস করিতে হইলে ক্ষমা গুণের নিয়ত অভ্যাস করা আবশ্যক। যতদিন না সকল মনুষ্য রাগদ্বেষের অতীত হন, ততদিন ক্ষমা-

গুণ ব্যতিরেকে পারিবারিক বা সামাজিক জীবন সুখ ও শান্তিময় হইতে পারে না। সকলেই কখন না কখন, জ্ঞানতঃ হউক বা অজ্ঞানতঃ হউক, পরের অনিষ্টাচরণ করিয়া ফেলেন। যাঁহার বিন্দুমাত্রও রাগদ্বেষ আছে, তিনি যে একদিন না একদিন পরের অপকার করিয়া ফেলিবেন, ইহা অনিবার্য্য। সুতরাং যদি আমরা পরস্পরের অপরাধ ক্ষমা করিতে শিক্ষা না করি, তাহা হইলে শান্তি ও প্রীতির সম্ভাবনা কোথায়? লোকে অজ্ঞানবশতঃই অপরাধ করে। অতএব অপরাধকারীর অজ্ঞতা দূর করাই তাহার একমাত্র প্রতিকার। প্রতিহিংসা দ্বারা অজ্ঞতা দূর হয় না; বরং সেই অজ্ঞতা দৃঢ়ীকৃত হয়—প্রতিকার না হইয়া বরং ব্যাধি আরও বদ্ধমূল হয়। অথবা ক্ষমা ও জ্ঞানদান ভিন্ন অপকার প্রবৃত্তির নিরাকরণ হইতে পারে না। তাই ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ। ইহার দ্বারা হৃদয়ের প্রসার হয় এবং পরের দুর্ব্বলতার জন্য ক্রোধের পরিবর্ত্তে কৃপার উদয় হয়। ক্ষমাশীল ব্যক্তি পরের কার্য্যে কখনই অসদুদ্দেশ্য দেখিতে চান না; কেবল ভ্রান্তি বা অজ্ঞতাই অপরাধের কারণ বলিয়া তিনি তাহার নিরাকরণে প্রবৃত্ত হন।

পরের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে উপরতি বা উদারতা আর একটী মহৎ-গুণ। ইহার প্রয়োগস্থল সমতুল্য বা নিকৃষ্ট ব্যক্তি। সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমাত্মা নানাবিধ উপাধির মধ্য দিয়া নানাপ্রকারে প্রকট হন। সুতরাং সকলের ক্রমবিকাশ একাবস্থ নহে এবং সকলের অধিকার সমান নহে; একজনের পন্থা বা মত কখনও সকলের উপযোগী হইতে পারে না। তোমার পন্থা তোমার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট; সেইরূপ অন্যজনের পন্থা তাহার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট। অতএব সকলকেই স্ব স্ব অধিকারানুরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে দেওয়া উচিত। এইরূপ পরের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে উদারতাকে

উপরতি বলে। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম চিরকালই উদার ও নানামতসহিষ্ণু। তাই হিন্দু কখনও অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলেন না অথবা নিজ সমাজমধ্যস্থ ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে মতান্তর গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করেন না। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে যেসকল বিভিন্ন দার্শনিক মত (ষড়দর্শন) প্রবল আছে তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, এ সম্বন্ধে আর্য্যদিগের কি প্রকার উদারতা ছিল। আত্মা এক, কিন্তু বিভিন্ন ঘটে বিভিন্ন গুণাশ্রয়ে তাঁহার বিকাশ বিভিন্ন প্রকার ; এই বিশ্বাস হইতেই আর্য্যদিগের পরধর্ম্মে ও পরমতের প্রতি এতাদৃশ উদারতা বা উপরতি ছিল। তাঁহাদের এই অত্যাশ্চর্য্য উদারতা স্বয়ং ভগবানের উদারতার অনুরূপ। সকলই ঈশ্বর, সকলেই তাঁহার ; সকল পন্থাই তাঁহার পন্থা ; যে যে পথে তাঁর অন্বেষণ করে, যদি তাহাতে ঐকান্তিকতা থাকে, তবে সে সেই পথেই তাঁহাকে পাইবে। যেমন মানব ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আগমনপূর্ব্বক এক নগরে প্রবেশ করে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানব ভিন্ন ভিন্ন মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিলেও যদি একাগ্রভাবে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে পাইতে চায়, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার সেই কামনা সিদ্ধ হইবে। অতএব মার্গ সম্বন্ধে কলহ করা কেবল অজ্ঞতার পরিচায়ক।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

(গীতা—৪।১১।)

যে আমারে যে ভাবেতে করে অন্বেষণ।
সেই পথে সেই ভাবে দিই দরশন॥
নানা দিক্ হ'তে নর নানা পথ বশে।
উপনীত হয় শেষে আমাতেই এসে॥

অতএব সর্ব্ব পন্থা জানিহ আমার।
একাগ্র হইয়া ভজ যেই পথ যার॥

যদি কেহ স্বল্পজ্ঞান বা স্বল্পাধিকার প্রযুক্ত দুরাধিগম্য পরমাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, তাঁহার কোন বিশেষ বিভূতি বা বিশেষ ভাবের অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে সেই এক সর্ব্বময় আত্মাই সেই বিশেষ বিভূতি বা ভাবের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস প্রণোদিত করেন। নশ্বরফলাকাঙ্ক্ষীকেও তিনি সেই ঈপ্সিত নশ্বর ফল দানপূর্ব্বক ক্রমশঃ সেই ফলের নশ্বরতা বুঝাইয়া দিয়া ইহজন্মে বা জন্মান্তরে তাঁহাকে নিষ্কাম-সাধনায় প্রণোদিত করেন ঃ—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়াঃ॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥
স তথা শ্রদ্ধয়াযুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্হিতান্॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।

(গীতা, ৭।২০-২৩।)

কামনায় হৃতজ্ঞান হয়ে যেই জন।
অন্যদেবে ইষ্ট আশে করয়ে পূজন॥
যেমন নিয়ম তাঁর করে সেই মত।
নিজপ্রকৃতির সদা হয়ে অনুগত॥
ভক্ত শ্রদ্ধাভরে যেই মূর্ত্তি পূজা করে।
তাতেই অচলা শ্রদ্ধা দিই আমি তারে॥
সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পূজিয়া তাঁহার।
করয়ে অভীষ্টলাভ আমার কৃপার॥

অল্পবুদ্ধি ভক্ত তাহে যেই ফল পায়।
নশ্বর সে ফল এই কহিনু তোমায়॥

পুনশ্চ ঃ

"যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চবন্তি তে॥"

(গীতা—৯।২৩-২৪।)

শ্রদ্ধায় যাহারা ভজে অন্য দেবতারে।
অবিধি পূর্ব্বক তাহে মোরে পূজা করে॥
সকল যজ্ঞের আমি ভোক্তা প্রভু হই।
এ বিশ্বে কোথায় কিবা আছে আমা বই॥
জানে না তত্ত্বতঃ মোরে তাহার কারণে।
তত্ত্বচ্যুত হয় তারা, জেনো ইহা মনে॥

সনাতন ধর্ম্মের এই উদার তত্ত্বযুক্তিসমন্বিত শিক্ষা প্রত্যেক আর্য্য-সন্তানের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। তাহা হইলে তাঁহারা পরধর্ম্মের প্রতি অনুদারতা ও গ্লানি পরিহার করিতে পারিবেন। অনুদার জনগণের প্রতিও উদারতা প্রদর্শন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, তাঁহারা এসম্বন্ধে জগতের আদর্শস্থানীয় হইবেন।

ধর্ম্ম অথবা ব্যক্তিগত মত সম্বন্ধে উক্তরূপ উদারতা বিহিত আছে বলিয়া, কেহ যেন মনে না করেন যে, তবে কোন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি কোন সাধু বা নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করিলে, তাহার প্রতিবিধান করিবার আবশ্যক নাই। সাধু ব্যক্তি নিজের প্রতি অত্যাচার উদার-ভাবে উপেক্ষা করিবেন; কিন্তু অপরের প্রতি অত্যাচার কখনই উপেক্ষা

বা সহ্য করিবেন না। অবশ্য প্রথমে কোমলতার সহিত তাহার নিবারণ বা প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিবেন ; কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, রাজবিধি সঙ্গত (in accordance with the law of the land) সর্ব্বপ্রকার কঠোরতা ও দৃঢ়তাসহকারে দুর্বৃত্তের অত্যাচার দমন করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে, বলপ্রয়োগেও পরাঙ্মুখ হইবে না ; নচেৎ তাদৃশ আচরণ উদারতার পরিবর্ত্তে কাপুরুষতা নামে অভিহিত হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাদশ অধ্যায় বিস্তৃত জ্ঞান ও যুক্তি সহকারে অর্জ্জুনকে ইহাই উপদেশ দিয়াছিলেন। আবার যুক্তি-তর্কের দ্বারা সত্যনির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা সাধারণকে কি ব্যক্তিবিশেষকে শিক্ষা বা মন্ত্রণা দিবার সময়ে, কিংবা অন্যকে ভ্রান্ত বা অশুভ অনুষ্ঠান হইতে বিরত করিবার জন্য অপরের মতের দোষ-প্রদর্শনকে অনুপরতি বা অনুদারতা বলা যায় না। ফল কথা, অন্ধ-বিশ্বাস ত্যাগই উদারতা। অন্ধবিশ্বাসবলে লোকে আপনাকে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ মনে করিয়া অপর সকলকে নিজের মত গ্রহণে বাধ্য করিতে চায়। নিজের মতই অভ্রান্ত, অপর সকলের মত ভ্রান্ত ; এই অন্ধবিশ্বাসে তাহার মত হইতে কেহ বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেই সে দণ্ড দিতে অগ্রসর হয়। এ প্রকার "গোঁড়ামি" অমার্জ্জনীয় এবং ইহার ত্যাগই উদারতা।

তুল্যব্যক্তির প্রতি অনুরাগ হইতে যে সমস্ত সদ্গুণের উৎপত্তি হয়, তাহা উপরে আলোচিত হইল। তুল্যব্যক্তির প্রতি দ্বেষ হইতে যে তদ্বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত দোষসমূহের আবির্ভাব হয়, তাহা বলা বাহুল্য। পাঠক হয় ত আশ্চর্য্য হইবেন যে, যে সকল সামান্য সামান্য দোষ প্রায় সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়, তাহারা সকলেই এই দ্বেষাভাবের ফল। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ সকল সামান্য

সামান্ত দোষও মানবসকলকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করে এবং তাঁহাদের মধ্যে বিরোধভাব জন্মাইয়া থাকে।

পরুষভাব বা কর্কশভাব সদয়তার বিপরীত। এই পারুষ্য বা রুঢ়তা হইতে বিষণ্ণভাব, রোষকর্কশভাব, বিরক্তিভাব, খিট্‌খিটে মেজাজ, প্রভৃতি সামান্ত সামান্ত দোষ সকল (যাহা অধিকাংশ মনুষ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে) উৎপন্ন হইয়া পারিবারিক শান্তি ও প্রীতি বিনষ্ট করিয়া থাকে। ইহারা সকলেই ক্রোধের রূপান্তর মাত্র এবং পরিজনমধ্যে বিষাদান্ধকার আনয়ন করে। পক্ষান্তরে ইহাদের বিপরীত প্রসাদগুণ হইতে সংসারে প্রফুল্লতার সূর্য্যালোক বিস্তার করিয়া থাকে। মনু ক্রোধ ও পারুষ্য সর্ব্বথা বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য বলিয়াছেন ঃ—

"নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনং।
দ্বেষং স্তম্ভং চ মানঞ্চ ক্রোধতক্ষ্ণো চ বর্জ্জয়েৎ ॥"

(মনু ৪।১৫৩)

নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবনিন্দা আর।
দ্বেষ, স্তম্ভ, মান, ক্রোধ, তিক্ষ পরিহার ॥

এবং ইহাই স্বাভাবিক কারণ। এই পাপগুলিই বিশেষভাবে মনুষ্যের দুঃখ সন্তাপ বৃদ্ধি করে। বাস্তবিক দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কষ্ট ও মনঃপীড়া সহ্য করিতে হয়, তাহার অধিকাংশই ক্রোধের বিভিন্ন মূর্ত্তি-সম্ভূত। তাই শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধকে কাম ও লোভের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিয়া তিনটীকে নরকের দ্বারত্রয় বলিয়াছেন।—

"ত্রিবিধং নরকস্তেদং দ্বারং নাশন মাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভ স্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥"

(গীতা ১৬।২১)

কাম ক্রোধ লোভ তিন এরা নরকের দ্বার।
ত্যজিবে ও তিনে, এরা নাশক আত্মার॥

তিনি ক্রোধকে আসুরিক সম্পদ্ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন (গীতা, ১৬।৪)। মন ক্রোধ দ্বারা অন্ধ হইয়া নানাবিধ পাপে প্রবৃত্ত হয়। ইহা পাপের প্রধান আকর। অসহিষ্ণুতা ক্রোধেরই রূপান্তর। যাঁহারা চরিত্রের ঔৎকর্ষ্য সাধনে যত্নবান, তাঁহাদিগকে সতত সেই মহারিপুর এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রভাব হইতেও আত্মরক্ষা করিতে হইবে। নিয়ত সকলের প্রতি সহিষ্ণু হইয়া সদয় ব্যবহারে যত্নবান হইলে, অবশ্যই এই রিপুর উচ্ছেদ সাধন হইবে।

রুক্ষভাবে পরদোষ প্রদর্শন, অসাক্ষাতে পরনিন্দা, কুৎসা ও কটূক্তি প্রভৃতি মহানুভবতার বিপরীত। ইহারা অশ্রদ্ধা ও অসম্মানের সমধর্ম্মী। এই সকল দোষ হইতে নিস্কৃতি পাইবার প্রকৃষ্ট উপায় এই যে, পরকে যে সকল দোষ জন্য আমরা তিরস্কার করিতে যাই, সেগুলি আমাদের নিজ-চরিত্রে আছে কি না, নিরন্তর আত্মপরীক্ষার দ্বারা তাহার নির্ণয় ও নিরাকরণ করা। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন।—

"রাজন্ সর্ষপমাত্রানি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি।
আত্মানো বিল্বমাত্রাণি পশ্যনপি ন পশ্যসি॥"

সর্ষপ প্রমাণ পরদোষ সদা দেখ।
বিল্বসম নিজদোষ দেখিয়া না দেখ॥

রূঢ়তা ও ধৃষ্টতা প্রভৃতি অভদ্রাচরণ, শিষ্টতা ও সম্ভ্রমের বিপরীত। আজকাল এই দোষগুলি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় এবং বর্ত্তমান ভারত-সমাজেও ইহা বিস্তৃত হইতেছে। ইহা অভদ্র ও অপকৃষ্ট চরিত্রের পরিচায়ক। ধৃষ্ট ব্যক্তি নিজের স্বল্পশক্তিতে অবিশ্বাস ও অন্তের সামর্থ্যে ও

মর্য্যাদায় অনাস্থা বশতঃ কেবল উচ্চ রব সাহায্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। যাঁহার আত্মসামর্থ্য ও মর্য্যাদায় বিশ্বাস আছে, তাঁহার মূর্ত্তি সৌম্য ও শিষ্টতাব্যঞ্জক এবং তাহার আচরণ ধৃষ্ট ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ বিপরীত।

কৌটিল্য, অসাধুতা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, কলহপ্রবণতা, অব্যবস্থিতচিত্ততা, ও চাপল্য প্রভৃতি দোষগুলি তুল্যব্যক্তির প্রতি ব্যবহারে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। ইহারা পারিবারিক ও সামাজিক-জীবনে যে কতশত বিপত্তি ঘটায়, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং অবশেষে হয় ত পরিবার, সমাজ এবং জাতিকে শতধা বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট করে। বলা বাহুল্য যে, ঈদৃশ কু-চরিত্র লোক সকল দেশের কুসন্তান এবং অচিরেই সকলের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধাভাজন হইয়া পড়ে।

প্রতিশোধলিপ্সা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা ক্ষমাশীলতার বিপরীত। ক্ষমা মহদন্তঃকরণের অঙ্গ এবং কলহ ও পার্থক্য নিবারক। পক্ষান্তরে প্রতিহিংসাবৃত্তি কলহকে চিরস্থায়ী করে এবং কালবশে যে বিরোধ বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া যাইত, তাহাকেও জাগরূক রাখে। ফল কথা, ক্ষমা যে ব্যাধির প্রতিকারক, প্রতিহিংসা তাহার দীর্ঘায়ুষ্কর। কর্ম্মফল-তত্ত্বের অজ্ঞতানিবন্ধন লোকে অপকারীর প্রত্যপকার করিতে চায়। কেহ তোমার অপকার করিলে, তোমার ভাবা উচিত যে, তোমার কোন পূর্ব্বকর্ম্মের (ইহজন্মেই হউক, বা পূর্ব্বজন্মেই হউক) ফলে এক্ষণে তোমার ঐ অপকার সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ তোমার স্বকর্ম্ম তোমাতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। ইহা কেবল ঋণপরিশোধ মাত্র। অতএব এক্ষণে আবার প্রত্যপকার করিলে, নূতন ঋণ করা হয় মাত্র। ভবিষ্যতে ঐ প্রত্যপকার আবার তাঁহাকে পরিশোধ দিতে হইবে অর্থাৎ ঐ

প্রত্যপকার আবার তাঁহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। এইরূপে কর্ম্মের জের বরাবর চলিতে থাকিবে এবং কর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন না হইয়া, সে শৃঙ্খল উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতে থাকিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ক্ষমাই এস্থলে শ্রেষ্ঠ কল্প ; তদ্দ্বারা ঋণমুক্তি হয় ও বিদ্বেষ-শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হয়। তোমার (পূর্ব্বকালের) স্বকৃতকর্ম্ম-রূপ-অস্ত্র হাতে না পাইলে, কেহ কখনও তোমাকে আঘাত করিতে পারে না। যদি ভবিষ্যতে আর আঘাত না পাইতে চাও, তবে প্রত্যপকার হইতে বিরত হও। সাধুজনের ন্যায় ঋণ পরিশোধ দিয়া তৃপ্তি ও শান্তিলাভ কর। আর নূতন হিসাব খুলিও না।

অনুপরতি বা পরধর্ম্মে অনুদারতা হেতু জগতে যে কত হত্যাকাণ্ড, কত রক্তপাত ও কত সমাজ ও জাতির ধ্বংস হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। একধর্ম্মাবলম্বী লোক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীগণকে বলপূর্ব্বক নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে কতশত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছে—ধর্ম্মপ্রচার ব্যপদেশে কত নরশোণিত-প্রবাহ যে পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে—ভগবানের নামে যে কত শত পৈশাচিক নৃশংসতা জগতকে কলুষিত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জগতের ইতিহাসের পত্রে পত্রে ধর্ম্মের উৎপীড়ন কাহিনী নররক্ত ও অশ্রু দ্বারা চিত্রিত আছে। স্পেন সাম্রাজ্য-ধ্বংশের ইতিহাস ইহার একটী অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনতিকাল পূর্ব্বে স্পেন পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের শীর্ষস্থানীয় ছিল। কিন্তু যেদিন স্পেন স্বীয় পরাক্রম-গর্ব্বে অন্ধ হইয়া য়িহুদী ও মুরজাতীয় প্রজাগণকে বিধর্ম্মী বলিয়া সহস্রে সহস্রে হত্যা করিয়া শেষে হতাবশিষ্ট লোকসকলকে নির্ব্বাসিত করে, সেইদিন হইতেই তাহার অধঃপতনের সূত্রপাত হয়।

তীব্র ও কলহপ্রিয় সাম্প্রদায়িকতা অনুপরতির প্রকারভেদ মাত্র। ইহা ধর্ম্মের একটী সূক্ষ্ম শত্রু। অধুনা ভারতবর্ষে এই সূক্ষ্ম শত্রুর আবির্ভাব হইয়া সনাতনধর্ম্মের চিরপ্রসিদ্ধ উদারতার উচ্ছেদ করিবার উপক্রম করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি হিন্দুকে হিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করিয়াছে এবং অসার বিষয়ের পার্থক্যসমূহ অতিরঞ্জন দ্বারা তাঁহাদিগকে অন্ধ করিয়া, সকলের সারাংশে বা মূলে যে একত্ব ও অভেদত্ব আছে, তাহা দৃষ্টিবহির্ভূত করিয়াছে। মানবগণ যতই ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ছাড়িয়া দূরে গমন করে এবং অর্থশূন্য বা অনধিগতার্থ বাহ্যক্রিয়াড়ম্বরে রত হয়, ততই তাহারা মতানৈক্য প্রদর্শনে নিপুণ ও বিবাদপরায়ণ হইয়া উঠে। কাজেই ধর্ম্ম তখন আর জগতের ধারণ-হেতু না থাকিয়া, বিনাশ-হেতু হইয়া পড়েন।

অধুনা এতদ্দেশে এবং অন্যান্য দেশেও ধর্ম্মের অনুদারতা অপেক্ষা লোকাচার বা দেশাচারের অনুদারতা সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। এই দেশাচার বা লোকাচারের অত্যাচার ভারতবর্ষে সমধিক প্রবল; কারণ এদেশে ধর্ম্মাচার ও সামাজিক আচার পরস্পর এরূপভাবে বিজড়িত যে, একটী ক্ষণস্থায়ী সামান্য লোকাচার অল্পদিনের মধ্যেই চিরস্থায়ী ধর্ম্মাচারে পরিণত হয় এবং তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মতদ্বৈধ হইলেই, উক্ত অনুদারতার সাহায্যে তাহা বিষম বিবাদ ও বিচ্ছেদের হেতু হইয়া উঠে।

যাঁহারা আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের এই অনুদারতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সর্ব্বসম্প্রদায়ের হিন্দুকে আপনার বলিয়া, এক-ধর্ম্মপরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য; কারণ সকল সম্প্রদায়ই

সেই এক সনাতনধর্ম্মদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র। একদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেমন কখনও পরস্পরের ঈর্ষা, দ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, গ্লানি বা অনিষ্টাচরণ করে না; প্রত্যুতঃ অযাচিতভাবে পরস্পরের দুঃখমোচনে, পুষ্টিসাধনে ও সহযোগিতায় নিয়ত ব্যতিব্যস্ত, তদ্রূপ আর্য্যধর্ম্মের সকল সম্প্রদায় অবিরত পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর থাকিবেন ও ভ্রমেও কেহ কাহারও ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা গ্লানি করিবেন না। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী-গণের প্রতিও তাঁহারা সম্পূর্ণ উদারভাব পোষণ করিবেন; যেহেতু সকল ধর্ম্মই এক মহাসত্যের নানাভাবের এক একটী বা ততোধিক বিশেষ-ভাব প্রদর্শন ও প্রবর্ত্তন করেন। সকল ধর্ম্মই সেই এক মহাসত্য দ্বার প্রণোদিত; সুতরাং তাহারা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ। সকল সহোদর সহোদরা যেরূপ সমবয়স্ক, সমবলশালী, সমজ্ঞানবান, সমপ্রকৃতিসম্পন্ন বা সমাধিকারী না হইলেও, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও সৌভ্রাত্র অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে ও থাকে, তদ্রূপ সকল আপ্তধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্প্রদায়, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভেদ সত্বেও, পরস্পরের সহোদরভাবে এক মহাসত্য দ্বারা পালিত ও রক্ষিত হইবেন। আর্য্যগণ ধর্ম্মসম্বন্ধে "বর্জ্জনের" পরিবর্ত্তে "অর্জ্জন" আপনাদের Watch word করিয়া জগতের আদর্শস্থানীয় হউন; কারণ সকল ধর্ম্মের প্রাণ পরমাত্মা এক ও অখণ্ড।

——o——

দশম অধ্যায়।

কনিষ্ঠের প্রতি ব্যবহার।

এইবারে আমরা কনিষ্ঠের প্রতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আলোচনা করিব। তাহা হইলেই আমাদের মানবগণের পরস্পর সম্বন্ধজাত সর্ব্বপ্রকার দোষ গুণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ হইবে। এখানেও সেই মূলসূত্র প্রযোজ্য যে, অনুরাগ বা ভালবাসার সম্বন্ধ হইতে সদ্‌গুণসমূহের উৎপত্তি হয় এবং দ্বেষ বা বিরাগ হইতে দোষ সমূহের আবির্ভাব হয়। কনিষ্ঠের প্রতি আচরণীয় সদ্‌গুণসমূহ উপচিকীর্ষার অন্তর্ভুক্ত; অক্ষম বা হীনাবস্থের প্রতি অনুরাগবশতঃ তাহার উপকার করিবার ইচ্ছাকে উপচিকীর্ষা বলে। পক্ষান্তরে, কনিষ্ঠের সম্বন্ধে পরিহার্য্য দোষসকল অহমিকার অন্তর্ভুক্ত। অহঙ্কারপ্রযুক্ত লোকে অপরকে হীন ও অক্ষম জ্ঞান করে এবং তাহার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়; বিদ্বেষ হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি।

কনিষ্ঠের প্রতি উপচিকীর্ষা, দয়া ও কৃপারূপে প্রকাশিত হয়। কাহারও দুর্ব্বলতা, অজ্ঞতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা দর্শন করিলে, সহৃদয় ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার অভাব নিরাকরণের জন্য ব্যগ্র হন; তাহাকে বল, জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রদান করিয়া আপনার সমকক্ষ করিয়া লইতে অগ্রসর হন। সহানুভূতিবশে তিনি কনিষ্ঠের দুর্ব্বলতা, অজ্ঞতা ও নির্ব্বুদ্ধিতাকে নিজের মনে করিয়া, দয়ার্দ্রচিত্তে তাহার নিরাকরণে সচেষ্ট হন। এই সকল গুণ হইতে বদান্যতা বা দানশীলতার উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ উপচিকীর্ষা কার্য্যে পরিণত হয়।

উক্ত সদ্‌গুণসমূহের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শিশুসন্তানের প্রতি জনক জননীর আচরণে পরিলক্ষিত হয়। শিশুর দুর্ব্বলতা, পরাপেক্ষিতা ও অসহায়তা পিতা মাতার অন্তঃকরণে স্বতই স্নেহ ও কোমলতা উৎপাদন করে এবং তাঁহাদের হৃদয় নিরাশ্রয় ও স্বাবলম্বনাক্ষম সন্তানের জন্ম স্নেহ ও দয়ায় আপ্লুত হইয়া থাকে। তখন তাঁহারা সুমধুর বাক্যে প্রেমালিঙ্গনে, স্মিত আস্যে ও সস্নেহ দৃষ্টিতে শিশুকে এমনভাবে উৎসাহদানে ও অভয় প্রদর্শনে তৎপর হন যে, সে আপনার ক্ষুদ্রতা ও দৌর্ব্বল্য ভুলিয়া যায় এবং তাঁহাদের বলে আপনাকে বলীয়ান মনে করিয়া, তাঁহাদের শক্তিকে নিজের ন্যায় প্রয়োগ করিয়া, নিজের অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করে। কৃপা ও দয়া, কর্ত্তা ও পাত্রের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করিয়া দেয়; সদয় ব্যবহার দ্বারা কনিষ্ঠের মন হইতে শঙ্কা ও সঙ্কোচ দূর করিয়া দিয়া তাহাকে অনুগ্রহকর্ত্তার সান্নিধ্যে উঠাইতে চায়। কনিষ্ঠের ভীরুতা ও সঙ্কোচ যত অধিক দেখেন, ততই তিনি অধিকতর কমনীয়তা, মৃদুতা ও মাধুর্য্য প্রদর্শন দ্বারা তাহার মনে অভয় ও নির্ভরশীলতা উৎপাদনে যত্ন করেন।

যদি শ্রেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে শক্তি ও বয়সের ব্যবধান অধিক হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃ কনিষ্ঠের মনে অধিকতর শঙ্কা ও সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। এজগতে দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার সর্ব্বত্র এত অধিক লক্ষিত হয় যে, সবলকে দেখিলে দুর্ব্বলের মনে প্রথমে ভীতির সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং সবলের উচিত যে, অধিকতর কোমলতা ও স্নেহ প্রদর্শনে তাহার ভয়ের ও সঙ্কোচের অপনোদনপূর্ব্বক তাহাকে ভ্রাতৃভাব-পোষণে উৎসাহিত করেন।

কৃপা, স্নেহ ও সহানুভূতিবশে লোকে দুর্ব্বলকে বলবানের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে যত্নবান হয় এবং এই রক্ষা ও আশ্রয় দানের চেষ্টা

হইতেই বীরত্বের Heroism আবির্ভাব হয়। দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য সানন্দে দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার করাকেই বীরত্ব বলে। পরের মঙ্গলের জন্য অক্লেশে নিজের প্রাণপর্য্যন্ত পণ করাই প্রকৃত বীরের ধর্ম্ম। সচরাচর যিনি রাজা বা দেশের জন্য অথবা ধর্ম্মের জন্য প্রাণদান করে, তাঁহাকেই লোকে বীর বলে। কিন্তু অনেক অজ্ঞাত নরনারী দৈনন্দিন জীবনে পরের জন্য আপনার প্রাণ ও স্বাস্থ্য অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তাহাও উহার সমতুল্য। চিকিৎসক ও ধাত্রীগণ (Nurses) মহামারী সময়ে রোগীর সেবায় কঠোর দুঃখ ও শ্রম সহ্য করিয়া যে অকালে কালকবলে পতিত হন; মাতা যে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনবরত শুশ্রূষা করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে সন্তানকে উদ্ধার করেন, কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহস্থ আশ্রিত পরিজনবর্গের প্রতিপালনার্থ নিজের শক্তি, স্বাস্থ্য ও বিশ্রাম অকাতরে ব্যয় করিয়া শেষে অত্যধিক পরিশ্রম নিবন্ধন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়েন; ইঁহাদের ঐকান্তিক পরার্থপরতার কীর্ত্তি ইতিহাসে লিখিত না হইলেও উহা যে বীরত্ব পদবাচ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। শৌর্য্য, সাহস ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণগুলি বীরত্বের অঙ্গ এবং দুর্ব্বলের প্রতি দয়া ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা হইতে—বিপন্নজনের দুখমোচনের চেষ্টা হইতেই—তাহাদের উৎপত্তি হয়। বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ ও তুল্য ব্যক্তির সম্বন্ধেও যখন এই সমস্ত সদ্‌গুণ আচরিত হয়, তখন তাঁহাদের অপরের এই সকল গুণের সাহায্য আবশ্যক হয় বলিয়াই বীর তাহা অকাতরে দান করেন। রাজা তাঁহার প্রত্যেক সৈন্য অপেক্ষা বহু উচ্চে অধিষ্ঠিত হইলেও তাঁহার রাজমুকুট রক্ষার্থ সেনাগণের বীরত্বের সাহায্য তাঁহার আবশ্যক হয়। ভাই ভাই সমান হইলেও সময়ে সময়ে একের অভাব অন্যে পূরণ করিতে সমর্থ

হয়। কিন্তু এই সকল স্থলেই সাহায্য-কর্ত্তাই বীর এবং যাঁহাদের অভাব তিনি পূরণ করেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার নিকট ঋণী হন। কৃপাপ্রদর্শন, আশ্রয়দান, বীরত্ব প্রভৃতি গুণগুলি বিশেষ ভাবে রাজা ও রাজপুরুষদিগের আচরণীয়।

বদান্যতাও কনিষ্ঠ সম্বন্ধে প্রকটিত হয়। আর্য্যশাস্ত্রে ও আর্য্য-জীবনে দানশীলতার অশেষ মহিমা কীর্ত্তিত আছে। দান যজ্ঞের বরাঙ্গ এবং বেদবিৎ সদ্‌ব্রাহ্মণগণের ভোজন ও বৃত্তিদান প্রায় তাহারই সমতুল্য। এই সকল শাস্ত্রবিধানের উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা মনুষ্য স্বীয় ঐশ্বর্য্য পরার্থে ব্যয় করিতে শিক্ষা করিয়া প্রকৃত যজ্ঞধর্ম্মে (Law of Sacrifice) দীক্ষিত হইবেন। মনু বলিয়াছেন :—

শ্রদ্ধয়েষ্টং চ পূর্ত্তং চ নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
শ্রদ্ধাকৃতে হ্যক্ষয়ে তে ভবতঃ স্বাগতৈর্ধনৈঃ॥
দানধর্ম্মং নিষেবেত নিত্যমৈষ্টিক পৌর্ত্তিকং।
পরিতুষ্টেন ভাবেন পাত্রমাসাদ্য শক্তিতঃ॥
যৎকিঞ্চিদপি দাতব্যং যাচিতেনানসূয়য়া।
উৎপৎস্যতে হি তৎপাত্রং যত্তারয়তি সর্ব্বতঃ॥

(মনু ৪।২২৬—২২৮)

শ্রদ্ধাসনে ইষ্টপূর্ত্ত কর অনুষ্ঠান।
স্ব-অর্জ্জিত ধনে আর হয়ে শ্রদ্ধাবান॥
যদ্যপি সাধন তার কর তুমি সদা।
হইবে অক্ষয় পুণ্য নাহি তার দ্বিধা॥
আচরিবে দান ধর্ম্ম ইষ্টপূর্ত্ত সনে।
উপযুক্ত পাত্র খুঁজে, পরিতুষ্ট মনে॥
অনসূয়াশূন্য হয়ে কর যদি দান।
যথাশক্তি, সামান্য হলেও পরিমাণ।

হইবে তাহতে যোগ্য পাত্রের উত্থান।
সর্ব্বপাপ হতে যিনি করিবেন ত্রাণ॥

দান কি ভাবে করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি দানকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং॥
আদেশকালে যদ্দানং অপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃত মবজ্ঞাতং তত্তামস মুদাহৃতং॥"

(গীতা ১৭।২০—২২)

প্রতি উপকার আশা কিছু না করিয়া।
অনুপকারীকে দান, কর্ত্তব্য বুঝিয়া॥
দেশ, কাল, পাত্র সব করি প্রণিধান।
নিষ্কাম ভাবেতে করে, সাত্ত্বিক সে দান॥
প্রতি উপকার কিম্বা ফলের আশায়।
ক্লেশে যেই দান বলি রাজস তাহায়॥
দেশ কাল পাত্র আদি নাহি প্রণিধান।
অশ্রদ্ধায়, অবজ্ঞায়—তামস সে দান॥

শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, কখন অসৎকার, অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞার সহিত দান করিবে না। অর্থীক শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন প্রকৃত মহানুভবতার পরিচায়ক। দাতার মনে করা উচিত যে, অর্থী দানগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন। এমন শ্রদ্ধা ও শিষ্টাচারের সহিত দান করা উচিত, যেন গ্রহিতা আপনাকে অধম বলিয়া—অনুগ্রহপ্রার্থী বলিয়া,

ধিক্কার না করেন। দান যদি বিন্দুমাত্রও ঘৃণা বা অবজ্ঞাযুক্ত হয়, তবে তাহাকে তামসিক দান কহে।

শ্রেষ্ঠ ও অভিজাতের প্রতি যেরূপ সম্বর্দ্ধনা ও শিষ্টাচার আচরণীয়, অক্ষম ও অধঃস্থ জনগণের প্রতিও তদ্রূপ। ভগবান মনু নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে এই কথা অতি স্পষ্টভাবে বলিতেছেন :—

"চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ॥"

(মনু ২।১৩৮)

চক্রারোহী কিম্বা বৃদ্ধ নবতির পর।
রোগী, ভারী, নারী আর স্নাতক যে নর॥
সেইরূপ রাজা কিম্বা যদি দেখ বরে।
পথ ছাড়ি দিবে সদা এসবার তরে॥

পদমর্য্যাদানুসারে কাহার পর কাহাকে ভোজন করান উচিত, তাহা নির্দ্দেশ করিবার সময়ে ভগবান মনু হীনবলকে অগ্রেই স্থান দিয়াছেন :—

"সুবাসিনীঃ কুমারীশ্চ রোগিণো গর্ভিণোস্তথা।
অতিথিভ্যোঽগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ণ॥ (মনু ৩।১১৪)

নববিবাহিতা বালা কিম্বা সে কুমারী।
রোগী হীনবল কিম্বা গর্ভবতী নারী॥
অতিথির আগে তাহে করাবে ভোজন।
বিচারের তাহে কিছু নাহি প্রয়োজন॥

অতিথির আগে বলাতেই সকলের আগে বলা হইল।

কনিষ্ঠ ব্যক্তির সদ্গুণ সকলের অনুসন্ধান করিয়া তাহার বিশেষ সমাদর করা উচিত। গুণগ্রাহিতা সমাজের বিশেষ মঙ্গলজনক। এবম্প্রকার গুণের সমাদর উদারভাবে ব্যক্ত হইলে যে মানব তদ্দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অধিকতর গুণপ্রদর্শনে আগ্রহ করিবে,

তাহাতে আর সন্দেহ কি ? পক্ষান্তরে মানবের মনে নিজের দুর্ব্বলতা, ক্ষুদ্রতা, নিকৃষ্টতা প্রভৃতি ভাব দৃঢ়াঙ্কিত হইলে, তাহার আর নিজ সামর্থ্যে বিশ্বাস থাকে না ; তখন সকল কার্য্যেই আপনাকে অসমর্থ জানিয়া সে ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অনেক সময়ে গুণগ্রাহীর একটী প্রশংসা-বাক্যে যথেষ্ট উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকে এবং প্রসূনোপরি সূর্য্যকিরণের ন্যায় উৎসাহিতের হৃদয়কে প্রস্ফুটিত করে।

কনিষ্ঠের প্রতি আচরণে সহিষ্ণুতার একান্ত প্রয়োজন। সহজেই তাহার শক্তি অল্প, বুদ্ধি অল্প, ধারণা অল্প এবং কার্য্যপটুতা অল্প ; তাহার উপর যদি শ্রেষ্ঠ তৎপ্রতি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধি-বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় এবং সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। সর্ব্বাপেক্ষা শিশু ও ভৃত্যগণের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রয়োজনীয়। জ্যেষ্ঠগণ যদি শিশু ও ভৃত্যগণের প্রতি সহিষ্ণু না হন, তাহা হইলে গৃহের শান্তি নষ্ট হয় এবং পারিবারিক উন্নতিরও ব্যাঘাত ঘটে। সবলের শক্তি দুর্ব্বলের রক্ষা ও সাহায্যের জন্যই প্রযুজ্য—তাহাদের বিনাশের বা বিভীষিকা প্রদর্শনের জন্য নহে এবং "সহিষ্ণুতা, মধুময়, কিছুতেই টলে না" প্রকৃত শক্তিশালী ও মহৎ চরিত্রেরই পরিচায়ক।

কবি বলিয়াছেন :—

"বিদ্যা বিবাদায়, ধনং মদায়,
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
মূর্খস্য বিজ্ঞস্য বিপরীতমেতৎ,
জ্ঞানায়, দানায় চ রক্ষণায় ॥"

সহিষ্ণুতা ও গুণগ্রাহিতা পিতামাতা ও শিক্ষকগণের বিশেষভাবে আচরণীয়।

কনিষ্ঠের প্রতি দ্বেষভাব হইতে অহমিকার উৎপত্তি হয়। উহার অপর নাম আত্মাভিমান। মায়ামূঢ় জীবাত্মা আপনাকে অপর সকল হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া থাকে এবং অধঃস্থ সকলকে নিকৃষ্ট বলিয়া অবজ্ঞা করে। অধিকন্তু আপনার শ্রেষ্ঠত্বকে সর্ব্বলক্ষ্য করিবার জন্য কনিষ্ঠগণকে আরও খর্ব্ব করিতে প্রয়াসী হয়। অহঙ্কারীর চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বল অক্ষরে চিত্রিত করিয়াছেন :—

"ইদমদ্যময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথং।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনং॥
অসৌময়া হতঃশত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহ মহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া।
যোক্ষে দাস্যামি মোদিষ্যো॥"

(গীতা ১৬।১৩—১৫)

আজি এই লাভ হয়েছে আমার।
এই মনোরথ হইবে পুরণ॥
এই এত ধন আছয়ে আমার।
পাব পুনরায় এই সব ধন॥
এই শত্রুনাশ করিয়াছি আমি।
আর সব শত্রু নাশিব এবার॥
আমিই ঈশ্বর, ভোক্তা কর্ত্তা আমি।
সিদ্ধ বলী নাহি সমান আমার॥
সুখী ধনমান অভিজনবান।
কেবা আছে বিশ্বে আমার মতন॥

করিব এবার যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
দানে পরিতুষ্ট করিব ভুবন॥
করিব, করিব আনন্দ সম্ভোগ।
স্বপ্নেতেও কেহ ভাবেনি যেমন॥

এরূপ দাম্ভিক ব্যক্তি যে কনিষ্ঠগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে এবং তাহাদিগকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। বিদ্রূপ, অবজ্ঞা, প্রগলভতা, ঘৃণা প্রভৃতি দোষ এবম্প্রকার সম্বন্ধ হইতে স্বতই উৎপন্ন হয়। গর্ব্বকারীর কল্পনায় তাহার ও তাহার অধঃস্থ জনগণের মধ্যের ব্যবধান যে কত বিশাল, তাহা বাক্যে ও কার্য্যে প্রকাশ করিয়া সে আনন্দ লাভ করে। তাহার আকৃতি প্রকৃতিতে মুখরতা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, ঔদ্ধত্য সর্ব্বদা প্রকাশিত হয় এবং ইহার ফলে, যাঁহারা তাহার সংস্পর্শে আসেন, তাঁহাদের মনে তৎপ্রতি বিরাগ ও ঘৃণা জন্মিয়া থাকে। যদি অধীন কোন ব্যক্তির নিকট তাহার লালসার কোন বস্তু থাকে, তবে সে ছলে, বলে, কৌশলে অধিকার করিবে এবং আবশ্যক হইলে, তজ্জন্য সে দস্যুবৃত্তি বা হত্যাকাণ্ড হইতেও পরাঙ্মুখ হয় না। তাহার শ্রেষ্ঠতা কেবল অন্যের প্রতি অত্যাচারে ও অন্যকে পদানত করিতে নিয়োজিত হয়। ইতিহাসে এরূপ অনেক দুর্ব্বৃত্তের কাহিনী পাঠ করা যায়। কত নৃশংস, প্রজাপীড়ক রাজা ও অন্যান্য অত্যাচারী রাজপুরুষগণ প্রজাবর্গের সর্ব্বস্বাপহরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে পদদলিত করিয়া, অবশেষে তাহাদিগকে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছে এবং সেই পাপের ফলে, পীড়িত প্রকৃতিপুঞ্জ বিদ্রোহী হইয়া রক্তস্রোতে দেশ প্লাবিত করিয়াছে ; শেষে, এমন কি রাষ্ট্রবিপ্লব ও অরাজকতা পর্য্যন্ত ঘটাইয়াছে। মনু বলিয়াছেন :—

অদণ্ড্যান দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥

অদণ্ড্য জনেরে রাজা করে দণ্ড দান।
দণ্ড্য জনে দণ্ড হতে দেয় পরিত্রাণ॥
অযশ অপার ঘটে ভাগ্যেতে তাহার।
শেষে যায় নরকেতে নাহিক নিস্তার॥

সমাজে ও পরিবারমধ্যে যদি শ্রেষ্ঠ ও প্রবীণেরা অধীন জনগণের প্রতি অনুরাগজনিত সদ্গুণসমূহের পরিবর্ত্তে বিরাগজাত দোষসকল আচরণ করেন, তাহা হইলে প্রাগুক্ত কুফলসমূহ ক্ষুদ্রাকারে সমাজে ও পরিবারমধ্যে সংঘটিত হইতে দেখা যায়। নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী পিতা ও প্রভু, সন্তান ও ভৃত্যগণের হৃদয়ে উৎপীড়িত জনসুলভ দোষসকল রোপণ করিয়া, শেষে তাহার কুফল প্রতিষেধ করিবার বৃথা চেষ্টা করেন।

দাম্ভিকতা, আধিপত্য-প্রদর্শন ও মৌনিতা (Reserve) প্রভৃতি দোষসমূহও ঐ অহমিকারই সামান্য ভাবান্তর মাত্র। যাঁহাদের মধ্যে নিরন্তর সহৃদয়তা, স্নেহ ও উন্মুক্তহৃদয়তা বিদ্যমান থাকা উচিত, তাঁহাদের মধ্যে ঐ সকল দোষের আবির্ভাব হইলে যে, গৃহে ও সমাজে নানা অনিষ্ট ঘটিতে পারে, ইহা বলা বাহুল্য। সুতরাং যুবকগণের সাবধান হওয়া উচিত, যেন তাঁহারা কনিষ্ঠের বা অধঃস্থ জনের প্রতি কথন এরূপ কর্কশাচরণ না করেন। তাঁহাদের অনুক্ষণ স্মরণ রাখা উচিত যে, শ্রেষ্ঠের কনিষ্ঠকে শিক্ষা দ্বারা, যতদূর সম্ভব, নিজের সমকক্ষ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কনিষ্ঠকে চিরকাল কনিষ্ঠাবস্থায় রাখিয়া তাহাকে যখন তখন নিজের শ্রেষ্ঠতার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া শ্রেষ্ঠের কর্ত্তব্য নয়। এরূপ করিলে, হয় কনিষ্ঠকে তোষামদপ্রবণ, ভীরু, অকর্ম্মণ্য,

কাপুরুষে পরিণত করা হইবে, না হয় তাহার মনে বিদ্রোহিতা, অহঙ্কার ও ঘৃণার উদ্রেক করা হইবে। পক্ষান্তরে, শ্রেষ্ঠ যদি কনিষ্ঠের সহিত সমকক্ষবৎ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও গৌরব করিতে শিক্ষা করিবে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সহযোগিতায় নিযুক্ত ও অনুগত হইয়া থাকিবে। যিনি নিঃস্বার্থভাবে অপরকে উন্নত করিতে চেষ্টা করেন, সমাজে তিনিই সম্মানিত হন। অপরকে পদানত রাখিয়া যিনি সম্মান পাইতে চাহেন, তিনি তৎপরিবর্ত্তে কপটসম্ভ্রম, বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

অতএব তরুণ বয়স হইতেই কনিষ্ঠ ও অধঃস্থ জনগণের প্রতি সহানুভূতি, কৃপা ও বদান্যতার সহিত ব্যবহার করিতে শিক্ষা করা উচিত। যিনি যৌবনে পরিবারস্থ কনিষ্ঠ ও ভৃত্যগণের প্রতি এইপ্রকার সদ্ব্যবহার করিতে অভ্যাস করেন, তিনি উত্তরকালে সমাজে ও জাতিমধ্যে তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক সমাজ-হিতৈষী, দেশ-হিতৈষী ও জগৎ-হিতৈষী হইতে পারিবেন।

একাদশ অধ্যায়।

গুণ ও দোষসমূহের পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া।

(REACTION.)

চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে নানা প্রলোভন ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। কিরূপে তাহাদিগকে অতিক্রম করা যায়, তাহা বুঝিতে হইলে, গুণ ও দোষ সকল পরস্পরের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়ার (Reaction) উৎপাদন করে, তাহা জানা আবশ্যক। ইহা বুঝিতে পারিলে, কি প্রকারে মন্দ কর্ম্মের প্রতিক্রিয়া পরিহারপূর্ব্বক নিজের ও পরের ইষ্টসাধন সুগম হয়, তাহা জানিতে পারা যাইবে।

এ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে, যাদৃশ হৃদয়াবেগ অপরের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাদৃশ হৃদয়াবেগই তাহার (সেই অপরের) মনে উৎপন্ন হয়। যদি কাহারও প্রতি ভালবাসা প্রয়োগ করা যায়, তবে তাহার হৃদয়ে ভালবাসার উদ্রেক হয়; দ্বেষ বা ঘৃণা প্রয়োগ করিলে, তাহার হৃদয়ে দ্বেষভাবই উদ্বুদ্ধ হয়। ক্রোধে ক্রোধ উৎপন্ন করে; বিরক্তিতে বিরক্তি উৎপাদন করে; নম্রতায় নম্রতা উৎপাদন করে; সহিষ্ণুতায় সহিষ্ণুতা উৎপাদন করে। একটু মনোযোগপূর্ব্বক নিজের ও পরের মনোভাব ও তজ্জনিত কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে অল্পকাল মধ্যেই এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। একের মনোভাব যে অপরের হৃদয়ে সংক্রমণ করে, একের দোষ ও গুণ যে তৎসন্নিহিত অপরের চরিত্রে সংক্রামিত হয়, ইহা ত নিত্য পরিদর্শনের বিষয়।

একজন ক্রোধপরবশ ব্যক্তির ব্যবহারে সন্নিহিত সকলের মনেই অল্পাধিক ক্রোধের উদ্রেক হইয়া পরস্পরের মধ্যে নানা বাদ-বিসংবাদ ঘটাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে একজন নম্রস্বভাব ব্যক্তি সকলের মধ্যে শান্তি ও প্রীতির প্রতিষ্ঠা করে।

সাধারণতঃ সমরাগদ্বেষবিশিষ্ট ও সমপদস্থ লোকের মধ্যে উল্লিখিত প্রকারে দোষ ও গুণের প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। কিন্তু সমতুল্য ব্যক্তির মধ্যে না হইয়া যদি অসমাবস্থা লোকের মধ্যে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে দোষ ও গুণের ক্রিয়া হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে ঠিক সেই সেই দোষগুণের উৎপত্তি না হইয়া সমজাতীয় বা সমভাবের দোষ ও গুণ অপরের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয়। শ্রেষ্ঠ যদি কনিষ্ঠের প্রতি ভালবাসা প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে কনিষ্ঠের হৃদয়ে ভালবাসার ভাব আবির্ভূত হইবে বটে; কিন্তু সেই ভালবাসা কনিষ্ঠোচিত আকার ধারণ করিবে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠের ভালবাসার প্রতিক্রিয়ায় কনিষ্ঠের মনে ভক্তি, বিশ্বাস, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি গুণের উদ্রেক হইবে। এইরূপে শ্রেষ্ঠের বদান্যতার প্রতিক্রিয়ায় কনিষ্ঠের মনে কৃতজ্ঞতা এবং কৃপার প্রতিক্রিয়ায় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে। পক্ষান্তরে শ্রেষ্ঠ যদি কনিষ্ঠের প্রতি ঘৃণা ও দ্বেষ প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়ায় কনিষ্ঠের হৃদয়ে ঘৃণা ও দ্বেষের ভাব উৎপন্ন হইবে বটে, কিন্তু সেই ঘৃণা ও দ্বেষ কনিষ্ঠোচিত আকার ধারণ করিবে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠের দ্বেষের প্রতিক্রিয়ায় কনিষ্ঠের মনে ভয়, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি দোষের উৎপত্তি হইবে। শ্রেষ্ঠের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় কনিষ্ঠের মনে অস্ফুট প্রতিকূলতা এবং নিষ্ঠুরতা হইতে অস্ফুট প্রতিহিংসা উৎপন্ন [illegible] নিয়মানুসারে ভাল হইতে ভাল এবং মন্দ

হইতে মন্দের উৎপত্তি হইবে বটে, তবে ঐ ভাল ও মন্দ ভাবসকল প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ প্রভৃতি পদোচিত হইবে।

অসাধারণ বা বিশেষ বিশেষ ভাবপ্রধান ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে আবার আর একটি নিয়মের ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়। কোন অসামান্য গুণবিশিষ্ট লোকের হয়ত প্রেমাবেগ এত প্রবল যে, তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধের প্রতিদানে ক্রোধের উদ্রেক হয় না; বরং তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে তিনি তাহার বিপরীত সদ্‌গুণ অর্থাৎ কৃপা প্রদর্শন করেন। কেহ তাঁহার প্রতি অহঙ্কার প্রদর্শন করিলে, তিনি তৎপরিবর্ত্তে তাহার বিপরীত সদ্‌গুণ অর্থাৎ বিনয় প্রকাশ করেন এবং বিরক্তি বা অসহিষ্ণুতার পরিবর্ত্তে সহিষ্ণুতা প্রতিপ্রয়োগ করেন। এ প্রকার মহদাচরণের ফলে, কেবল যে দোষ প্রদর্শনকারীর দোষ পরাহত ও নিরস্ত হয় তাহা নহে, প্রত্যুত সেও সেই মহদাচরণ অনুকরণে প্রণোদিত হয়।

পক্ষান্তরে আবার অসাধারণ দোষপ্রধান ব্যক্তির হৃদয়ে দ্বেষভাবের প্রাচুর্য্য বশতঃ অপরের সৎভাবের প্রত্যুত্তরে অসৎভাবেরই উদয় হয়। এপ্রকার লোক বিনয়ের প্রতিদানে অহঙ্কার প্রদর্শন করে; নম্রতা বা শিষ্টাচারের পরিবর্ত্তে অবমাননা করে এবং সহিষ্ণুতার প্রত্যুত্তরে অধিক মাত্রায় অত্যাচার করিয়া থাকে।

অতএব আমরা দুইটী নিয়ম দেখিতে পাই!—

১। সাধারণ লোকের মধ্যে ভাল ও মন্দ হৃদয়াবেগ সকল (অর্থাৎ গুণ ও দোষ সকল) যথাক্রমে সেই সেই হৃদয়াবেগ অথবা সমজাতা বা সমভাবের হৃদয়াবেগ সকল (গুণ ও দোষের) উদ্রেক করে।

২। অসাধারণ ব্যক্তি সম্বন্ধে অর্থাৎ যাঁহাদের চরিত্রে প্রেম অথবা দ্বেষ বিশেষভাবে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত

হইলে, হৃদয়াবেগ সকল (অর্থাৎ গুণ ও দোষ সকল) তাঁহাদের চরিত্র-গত প্রধান ভাবানুগামী সমজাতীয় বা বিপরীত জাতীয় হৃদয়াবেগ সকল (অর্থাৎ গুণ ও দোষ সকল) উৎপাদন করে।

দুই একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টী একটু বিশদ করা যাইতে পারে। মনে কর, দুইজন সাধারণ, সমতুল্য ব্যক্তির পরস্পর সাক্ষাৎ হইবার পর, একজন অপরকে ক্রুদ্ধভাবে সম্ভাষণ করিল; স্বভাবতঃ শেষোক্ত ব্যক্তি রোষবিস্ফারিত লোচনে, পরুষভাষায় তাহার প্রত্যুত্তর করিল। প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া রূঢ়তর ভাষায় তাহার পুনঃ প্রত্যুত্তর করিল। এইরূপে ক্রমশঃ বচসা হইতে গালাগালি, গালাগালি হইতে হাতাহাতি, শেষে রক্তপাত পর্য্যন্ত হইল। হায়! কত শত সহস্র বন্ধুবিচ্ছেদই না এই প্রকারে, একজনের কোপন স্বভাব হইতে, সংঘটিত হইয়াছে।

আর দুইটি ব্যক্তির পরস্পর সাক্ষাৎ হইবার পর একজন রুষ্টভাষায় অপরকে সম্ভাষণ করিলেন কিন্তু শেষোক্ত অতি বিনীতভাবে, সস্মিত-বদনে ও প্রিয়জনসুলভ অঙ্গসঞ্চালনে তাহার প্রতি সম্ভাষণ করিলেন। প্রথমোক্তের ক্রোধাগ্নিতে শেষোক্ত যেন সুশীতল বারি ঢালিয়া দিলেন এবং এইরূপে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, প্রথম ব্যক্তি স্মিত আস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্তগ্রহণ করিয়া সদালাপ করিতে করিতে গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন।

আবার যাঁহাদের দ্বেষভাব প্রবল, তিনি যদি অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হন, তবে কনিষ্ঠের প্রতি ঔদ্ধত্য ও ভাতিপ্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তাহাকে বলপূর্ব্বক নিজ ইচ্ছানুবর্ত্তী করিতে চেষ্টা করেন। কনিষ্ঠ অবশ্য ভীত, সন্দিগ্ধ ও বিমর্ষভাবে তখন তাঁহার আদেশের অনুবর্ত্তী হয়; কিন্তু

তাহার হৃদয় অত্যাচারীর অনুগত হইতে পারে না ; তাহাতে প্রতি-হিংসার বাসনা উৎপন্ন হয় এবং যতদিন না সুযোগ ঘটে ততদিন ঐ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে। প্রবল ব্যক্তিও তাহার সেই ভীরু ও ক্রোধবিমর্ষ ভাব দেখিয়া অধিকতর ঔদ্ধত্য ও বিদ্রুপ প্রদর্শন করেন। এতদ্দ্বারা যদিও নিকৃষ্টের ভয়, সন্দেহ ও কাপুরুষতা বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে অত্যাচারীর পদানত ও আজ্ঞাকারী হইতে বাধ্য করে, কিন্তু তাহার মনে প্রতিহিংসা বাসনা শতগুণে তীব্রতর হয় এবং সে অনুক্ষণ সেই বাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে। এইরূপ উভয়ের মনোভাবের ঘাত প্রতিঘাতে উত্তরোত্তর উভয়েরই পাপপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একটী অশুভ কর্ম্মচক্র উৎপন্ন হয়।

পক্ষান্তরে কোন অনুরাগ বা প্রেমপ্রাণ ব্যক্তি যদি এমন কোন কনিষ্ঠ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন যে, শ্রেষ্ঠকে দেখিয়াই স্বভাবতঃ তাহার মনে ভয় ও সন্দেহের উদয় হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ে কৃপা ও অনুকম্পার উদ্রেক হয় এবং তিনি অধিকতর সদয় ব্যবহারেও সস্নেহ সম্ভাষণে তাহার ভয় ও সন্দেহের অপনোদন করিতে চেষ্টা করেন। এইপ্রকার সবিনয় ও সদয় ব্যবহারে কনিষ্ঠ অবশ্য উৎসাহিত ও আশ্বস্ত হয় কিন্তু তত্রাপি সে অল্পশঙ্কিত চিত্তে তাঁহার নিকটগামী হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠের শিষ্টাচারে সেই শঙ্কা দূরীভূত হইয়া কনিষ্ঠের মনে বিশ্বাস, নির্ভীকতা ও শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়। এইরূপে তাহার হৃদয়ে ভালবাসার উদ্রেক হইয়া দোষের পরিবর্ত্তে গুণের বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে এবং উভয়ের মধ্যে আনন্দ ও শান্তি-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইতিহাস ও পুরাণাদিতে এইপ্রকার হৃদয়াবেগের প্রতিক্রিয়ার বহুল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। দুর্য্যোধনের প্রমাদ দেখিয়া ভীম ব্যঙ্গপূর্ণ উপহাস করাতে তাহার হৃদয়ে দ্বেষ ও প্রতিহিংসার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ তাহা বর্দ্ধিত হইয়া কুরুপাণ্ডব মহাযুদ্ধের অন্যতর কারণ হইয়া উঠে। কৌশল্যা রামনির্ব্বাসনাজ্ঞা শ্রবণে দুঃখে বিহ্বল হইয়া স্বামির প্রতি কটূক্তি করিলে, রাজা দশরথ বিনয়নম্রভাবে তাহার প্রত্যুত্তর করেন এবং তাহার ফলে, কৌশল্যার হৃদয়ে অচিরে অনুতাপ ও প্রেমপূর্ণ নম্রতার আবির্ভাব হইরাছিল। শ্রীকৃষ্ণের বিরাটরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের হৃদয় ভয়াকুলিত হইলে, ভগবান পুনরায় তাঁহার সৌম্য মানবমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক অভয় প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাতে অর্জ্জুন সত্বর প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। আমাদের শিক্ষার জন্য এই সকল উপদেশপূর্ণ উপাখ্যান পুরাণাদিতে লিখিত আছে। ইহা হইতে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, একজনের কুব্যবহারের প্রতিদানে কুব্যবহার প্রয়োগ করিলে দোষ নিরাকরণ হয় না; প্রত্যুত দোষের পরিবর্ত্তে তদ্বিপরীত গুণ প্রয়োগ করিলে তাহার পরিহার করা যায়। জ্বলিবামাত্রেই, চেষ্টা করিলে, অগ্নি সহজে নির্ব্বাপিত হয়, কিন্তু ইন্ধন পাইলে অগ্নি আরও প্রবল হয় এবং তখন নির্ব্বাপিত করা বড়ই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। হয়ত শেষে সকল চেষ্টা বিফল করিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ সকল পদার্থ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে।

শিক্ষার্থীরা এতক্ষণে বোধ হয়, উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, মহাচার্য্যদিগের বিধান ও উপদেশসকল কিরূপ বিজ্ঞানসম্মত এবং কেন মহাচার্য্যেরা সকলেই একবাক্যে আদেশ করিয়াছেন যে—"অনিষ্টের পরিবর্ত্তে ইষ্টদান কর, কখনও অনিষ্ট প্রতিদান করিও না।" এতক্ষণে

আমরা বুঝিতে পারিব কেন, তাঁহারা সকলে সমস্বরে বলিয়াছেন—"অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, তাহাদের প্রতি তুমিও সেইরূপ ব্যবহার করিবে।" যথা :—

"যদন্যৈর্বিহিতং নেচ্ছেদাত্মনঃ কর্ম্ম পুরুষঃ।
ন তৎপরেষু কুর্ব্বীত জানন্নপ্রিয়মাত্মনঃ।
যদ্যদাত্মনিচেচ্ছেত তৎপরস্যাপি চিন্তয়েৎ ॥"

(মহাভারত ; শান্তিপর্ব্ব—৮৬ ।)

ইহাই আচরণ-বিজ্ঞান বা নীতিবিজ্ঞানের সার মর্ম্ম ; যেহেতু সেই "অপর বা অন্যজনগণ" বস্তুতই "তুমি"—তাহারা এবং তুমি সকলে জড়াইয়া এক—অর্থাৎ সকলেই এক আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গমাত্র ; তাহারা এবং তুমি যখন অভিন্ন, তখন তোমার জন্য যাহা ইচ্ছা কর, তাহাদের জন্যও তাহাই ইচ্ছা করিবে এবং তোমার জন্য যাহা ইচ্ছা কর না, তাহাদের জন্যও তাহা ইচ্ছা করিবে না। মনু বলিয়াছেন :—

"ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাকৃষ্টঃ কুশলং বদেৎ।"

(মনু—৬।৪৮।)

ক্রুদ্ধ জনে প্রতিক্রোধ কভু না করিবে।
রুষ্ট সম্বোধিত হয়ে মিষ্ট সম্ভাষিবে ॥

সামবেদে উপদিষ্ট হইয়াছে :—

সেতুংস্তর দুস্তরান্ অক্রোধেন ক্রোধং সত্যনানৃতং।

(আরণ্যগান, অর্কপর্ব্ব, ২য় প্রপাঠক।)

পার হও সেতু সে দুস্তর।
অক্রোধে ক্রুদ্ধেরে কর জয়।
সত্য বলে, মিথ্যা কর লয় ॥

ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছেন :—

"দ্বেষে দ্বেষ নাহি নাশ হয়।
প্রেমে দ্বেষ যাইবে নিশ্চয়।"

পুনশ্চ :—

"অকারণে মোরে কেহ করিলে পীড়ন।
আমি তারে প্রেমভরে দিব আলিঙ্গন॥
যত দুঃখ, অনিষ্ট সে করিবেক দান।
ততোধিক ইষ্ট তার করিব বিধান॥"

অপিচ :—

"দ্বেষকারীজনে দ্বেষ করে যেই জন।
কভু না হইবে সেই পবিত্র জীবন॥
কভু দ্বেষভাব নাহি যাঁহার অন্তরে।
অপরের দ্বেশ তিনি নাশেন সত্বরে॥
অক্রুদ্ধ হইয়া কর ক্রোধে পরাজয়।
হিত সাধি কর সদা অহিতের লয়॥
গ্রাসেচ্ছুকে ধন-দানে পরাস্ত করিবে।
সত্যবাক্যে মিথ্যা নাশ অবশ্য সাধিবে॥"

লাও জে (Lao Tze) বলিয়াছেন :—

সাধু জন প্রতি আমি সাধু হই সদা।
অসাধুর প্রতি করি সাধুতা সর্ব্বদা॥
এরূপে যাহারা আসে নিকটে আমার।
তারাও সকলে ক্রমে হয় সদাচার॥
অকপট জনে আমি সদা অকপট।
কপট জনেও আমি হই অকপট॥
এরূপে যাহারা আসে নিকটে আমার।
কপটতা ছাড়ি সবে হয় সদাচার॥"

যিশু খ্রীষ্ট বলিতেছেন ঃ—

"ভালবাস সদা তব শত্রুগণে।
আশীর্ব্বাদ কর, শাঁপ গালি শুনে॥
যেবা ঘৃণা করে, কর ভাল তার।
যে করে পীড়ন কিম্বা অত্যাচার॥
সে সকল তব মন্দকারী তরে।
ঈশ্বরের কৃপা মাগ জোড় করে॥

মন্দ ব্যবহারের প্রতিশোধ লইলেই যথার্থ সেই মন্দ কার্য্য সফল হয়। অনিষ্টের প্রতিশোধ লইলেই তাহাকে চিরস্থায়ী করা হয়। ঈন্ধন যেমন অগ্নিকে প্রজ্জলিত করে, প্রতিহিংসা তদ্রূপ কুপ্রবৃত্তিকে সমাধিক প্রজ্জলিত করে। কুব্যবহার উপেক্ষিত হইলেই ব্যর্থ হয়; অগ্নিতে জলসিঞ্চনের ন্যায়, প্রেমধারা বিদ্বেষাগ্নি নির্ব্বাপিত করে। দ্বেষাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেই সুখোৎপত্তি হয়, কিন্তু প্রচুর প্রেম-প্রবাহ ব্যতিরেকে তাহা নির্ব্বাপনের অন্য উপায় নাই।

এইটী সাধারণ বিধি এবং প্রকৃত পক্ষে অসাধুকে সাধু করিবার এইটীই শেষ উপায়। ব্যবহারিক জগতে কিন্তু ইহার বিশেষ বিধির প্রয়োজন আছে। দেশবিশেষে ও কালবিশেষে যাঁহারা সমাজের শান্তি-রক্ষার ও অনিষ্ট নিবারণের ভার লইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য সুবিচার-পূর্ব্বক গর্হিত অপরাধসকলের দণ্ডবিধান করিতে হইবে। সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য বা সমতা স্থাপন করা প্রকৃতির একটি ধর্ম্ম (Law of Equilibrium) রাজা ও প্রাড়বিবাকগণ সমাজসম্বন্ধে এই নৈসর্গিক বিধির প্রতিনিধি-স্বরূপ। সুতরাং রাজা বা রাজপুরুষগণ সার্ব্বজনীন প্রেম হৃদয়ে রাখিয়া ও প্রতিহিংসাপরায়ণ না হইয়া, সমাজে শান্তি স্থাপন জন্য দুষ্টের দমন

ও শাস্তিবিধান করিলে, তাহাতে নীতিশাস্ত্রের অমর্য্যাদা হয়। সমাজ-বিপ্লব-প্রতিষেধ জন্ম ও সমাজবন্ধনের সমতা (Equilibrium) রক্ষার জন্য, এই বিশেষ বিধির প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই উপরি লিখিত সাধারণ বিধি অর্থাৎ ইষ্টসাধন দ্বারা অনিষ্টের প্রতিদান বিধি প্রযুজ্য।

শিক্ষার্থীরা এক্ষণে দোষ ও গুণের, পাপ ও পুণ্যের প্রকৃতি এবং তাঁহাদের পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। এখন তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক স্ব স্ব চরিত্রে প্রেমপ্রবণতা আনিতে চেষ্টা করুন, অর্থাৎ সার্ব্বজনীন প্রেম নিজ নিজ স্বভাবসিদ্ধ করিতে যত্নবান হউন; তাহা হইলে প্রেমজনিত সদ্‌গুণসমূহে স্ব স্ব চরিত্র অলঙ্কৃত করিতে পারিবেন এবং সন্নিহিত জনগণের হৃদয়েও ঐ সকল সদ্‌গুণ উদ্বুদ্ধ করিয়া সমগ্র মানবজাতির কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতে পারিবেন।

তাঁহাদের সদাচরণে শ্রেষ্ঠগণের হৃদয়ে উপচিকীর্ষা, দয়া ও স্নেহের উদয় হইবে। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, সেবাপরায়ণতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও আজ্ঞাকারিতা প্রদর্শন করিলে, শ্রেষ্ঠগণের হৃদয়ে ঐ সকল গুণের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। যদ্যপি কোন প্রধান ব্যক্তি কোন সময়ে তাঁহাদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেন, তবে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তদুদিত শঙ্কাদি কুভাবকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া অকপট নম্রতা ও শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহার হৃদয়ে অনুরাগ উদ্দীপ্ত করিতে যত্নবান হইবেন; তাহা হইলে রূঢ়তার পরিবর্ত্তে অনুকম্পা এবং গর্ব্বের পরিবর্ত্তে কৃপার প্রকাশ হইবে।

তুল্য জনের প্রতি সখ্যতা ও প্রীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক শিক্ষার্থীরা তাহাদের হৃদয়েও প্রীতির উদ্রেক করিবেন। সদয়াচরণ দ্বারা তাহাদের হৃদয়ে সদয়ভাবের, শিষ্টতা প্রদর্শন দ্বারা শিষ্টাচারের এবং সত্যনিষ্ঠা

প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদের চরিত্রে সত্যনিষ্ঠার উৎপাদন করিবেন। যদ্যপি কোন তুল্যব্যক্তি দ্বেষভাবসুলভ দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে যেন তাঁহারা আত্মসংযম করিয়া দোষপ্রতিদানে বিরত হন ; প্রত্যুত তদ্বিপরীত অনুরাগাত্মক গুণ প্রদর্শন করিয়া সদ্ভাব ও শান্তি বিস্তার করেন। নির্দ্দয়াচরণের পরিবর্ত্তে সহৃদয়তা, অশিষ্টাচারের পরিবর্ত্তে শীলতা ও সৌজন্য এবং প্রতারণার পরিবর্ত্তে সততা ও সরলতা প্রতিদানপূর্ব্বক অজ্ঞ ভ্রাতার হৃদয়ক্ষেত্রের কণ্টক নাশ করিয়া সাধুতার বীজবপন করিবেন। এইরূপে তাঁহারা কেবল যে পরকৃত অমঙ্গলের পরিহার করিতে ও আত্মসদ্ভাব দৃঢ়তর করিতে পারিবেন তাহা নহে, প্রত্যুত অপরপক্ষ যদি নিতান্ত দুর্বৃত্ত না হয়, তবে তাহারও হৃদয়ে সদ্ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে উন্নতিমার্গে অগ্রসর করিতে সমর্থ হইবেন।

কনিষ্ঠ ও অধীন জনের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বীজ বপন করিবেন ; নম্রতা ও সহিষ্ণুতা দ্বারা তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া তাহাদের হৃদয় হইতে ভয় ও সন্দেহের অপনোদন করিবেন। কাহাকেও ভয় ও সন্দেহ প্রদর্শন করিতে দেখিলে, কদাচ তাহার প্রতি বিদ্রুপ বা ঘৃণা প্রয়োগ করিবেন না ; প্রত্যুত অধিকতর নম্রতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্রমশঃ কনিষ্ঠের হৃদয়কে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া উভয়েরই আনন্দবিধান করিবেন।

পরিবার, সমাজ ও জাতিমধ্যে মানবগণের পরস্পর সম্বন্ধ যদি এই সকল সনাতন বিধি অনুসারে নিয়মিত হয়, তাহা হইলে অচিরে জগতের সর্ব্বত্র কি অনির্ব্বচনীয় সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা ভাবিলেও মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তখন সর্ব্বত্র অশান্তি, অপ্রীতি ও দুঃখের পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দিকে শান্তি, প্রীতি ও সুখ বিরাজিত হইবে। কর্ম্ম বুদ্ধি-

দ্বারা নিয়মিত হইলে, সদবুদ্ধি হইতে সৎকর্ম্মের উৎপত্তি হইবে এবং তাহাই নীতিবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সর্ব্বদা লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহাই সাধু-চরিত্র গঠনের একমাত্র পন্থা এবং এইরূপে চরিত্র গঠিত করিতে পারিলে তবে আর্য্যসন্তানগণ ভারতমাতার উপযুক্ত সন্তান হইতে পারিবেন। জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা এই যে, যেন তাঁহারা সদুপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক সাধুজীবন লাভ করিতে পারেন।

"আমি তোমাদিগকে হৃদয় ও মনের সম্পূর্ণ একতা বিধান করিলাম; ইহাতে দ্বেষের বিন্দুমাত্রও স্থান নাই। গাভী যেমন নবপ্রসূতবৎসে স্বতঃই অনুরক্ত হয়, সেইরূপ তোমরা পরস্পরে অনুরক্ত হইবে। পুত্র যেন পিতার অনুগামী এবং মাতার সহিত অভিন্নহৃদয় হন। পত্নী যেন চিরদিন স্বামীর প্রতি মিষ্টভাষিণী হন এবং তাঁহার সহিত শান্তিতে বাস করেন॥ ভ্রাতা যেন ভ্রাতা বা ভগ্নির সম্বন্ধে অসূয়াপরবশ না হন। সকলে পরস্পরের প্রতি সদাচরণ করিয়া সর্ব্বত্র শান্তি ও প্রীতি স্থাপন করুণ।"

॥ ওঁ ॥ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ওঁ ॥